তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না ; এখন আমি যদি এই টাকা আত্মসাৎ করি, কেহই আমাকে সন্দেহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য ? দুষ্কর্ম্ম করিবার এমন সুযোগ মনে কল্পনা করাও কঠিন। শুধু যদি আমার স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ঐ গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিতে আমি একটুও ইতস্তত করিব না। যদি ইতস্তত করি, তাহা হইলে স্বার্থবাদিদিগের মতে আমি একজন বাতুল, আমার নিজের প্রকৃতির নিকট আমি বিদ্রোহী। আমি ইহার জন্য দণ্ডিত হইব না নিশ্চয় জানিয়াও তবু যে আমার মনে একটু ইতস্তত হইতেছে ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, স্বার্থবুদ্ধি হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে নিহিত আছে।

কিন্তু স্বভাবত আমার মনে কোন দ্বিধা হয় না ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে তাহা আমার নহে, তাহা অন্যের। স্বার্থকে অপসারিত করিলে, ঐ গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিবার কথা আমার মনেও আসিবে না ; কেবল স্বার্থ বুদ্ধিই আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে, স্বার্থবুদ্ধিই আমাকে পাপের পথে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি তাহাকে ঠেকাইতে পারিতেছি না। উহা হইতেই, স্বার্থবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া যায় ; এই সংগ্রামটা কি কষ্টপ্রদ ; এই সংগ্রামে আমাদের কত সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে—কত প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সংগ্রাম হইতেই বেশ বুঝা যায়, স্বার্থ হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত আছে, এবং সেই প্রবৃত্তিটি স্বার্থেরই ন্যায় বলবতী।

অবশেষে কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরাভূত হইল, স্বার্থই জয়ী হইল। আমি সেই গচ্ছিত টাকা ভাঙ্গিয়া আমার অভাব, আমার পরিবারবর্গের অভাব পূর্ণ করিলাম। আমি ধনশালী ও বাহ্যতঃ সুখী হইলাম। কিন্তু আমি মনে মনে অনুতাপের তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। অনুতাপ বলিয়া যে একটা জিনিস আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। ইহার প্রতিরূপ শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। এমন লোক নাই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুতাপ অনুভব করে নাই। যতক্ষণ না অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় ততক্ষণ হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। আমার সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও আমার দুষ্কৃতির স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করে ; লোকের স্তুতিবাদ, এই দুর্নিবার সাক্ষীর মুখ বন্ধ করিতে পারে না। যদি এই অনুতাপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অপরাধীর আর কোন উপায় থাকে না—সে একেবারে অধঃপাতে যায়, তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ হৃদয়ে অনুতাপের অনুভূতি থাকে, ততক্ষণ জানা যায়, হৃদয়ের স্বর্গীয় অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

অনুতাপ একটা বিশেষ প্রকারের কষ্ট। অমুক অমুক বিষয় আমার ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিংবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিংবা আমার স্বার্থহানি হইয়াছে, কিংবা আমার হৃদয় আশা ও আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছে—এই সকল কারণে আমি অনুতাপের কষ্ট ভোগ করি না ; এই কষ্ট বাহির হইতে আইসে না, তথাপি ইহার মত দারুণ কষ্ট আর নাই। আমি শুধু এই জন্যই কষ্ট পাই যে, আমি জানিয়া বুঝিয়া

একটা খারাপ কাজ করিয়াছি, সে কাজ আমি না করিলেও করিতে পারিতাম, এবং তাহার দণ্ড স্বরূপ আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি, এবং ইহাও জানি আমি এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই অনুতাপের মধ্যে ভালমন্দের জ্ঞান, একটা অবশ্যপ্রতিপাল্য ধর্ম্মের নিয়ম, স্বাধীনতা ও পাপপুণ্যের ধারণা নিহিত আছে। কার্য্যকালে এই সকল ভাবের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, অনুতাপকালে সেই সকল ভাব আবার আবির্ভূত হয়। সেই গচ্ছিত টাকা হরণ করিবার জন্য স্বার্থ আসিয়া আমাকে কত পরামর্শ দিল; কিন্তু কে যেন আমাকে বলিয়া দিল, গচ্ছিত ধন অপহরণ করা একটা অন্যায় কাজ; আমি যে এই কাজকে অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি তাহা শুধু আজিকে নহে, চিরকালই এইরূপ মনে করি; শুধু যে এই অবস্থায় কিংবা ঐ অবস্থায় অন্যায় বলিয়া মনে করি তাহা নহে, সকল অবস্থাতেই অন্যায় বলিয়া মনে করি। যাহাকে এই গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহার ঐ ধনে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—আমাকে এ কথা বলা বৃথা। আমার বিবেচনায় গচ্ছিতধন ফিরাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ও ঐকান্তিক কর্ত্তব্য। আমি ইচ্ছা করিলে উহা ফিরাইয়া দিতে পারি কিংবা নাও পারি—এই জ্ঞানটি থাকাতেই,—আমি উহা ফিরাইয়া না দিলে, আপনাকে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচনা করি, আমার নিজের উপর একটা ধিক্কার উপস্থিত হয়, আমার হৃদয়ে অনুতাপের যন্ত্রণা হয়। এই অনুতাপের মধ্যেই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটা আবদ্ধ, এবং এই অনুতাপের দ্বারাই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারের সম্যক ব্যাখ্যা হইতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়মানুসারে, ইহার উল্টা প্রকরণটা কি, তাহাও একবার দেখা যাক্; আবার উল্টা দিকটা মনে করা যাক্;—স্বার্থের প্ররোচনা সত্ত্বেও, দুঃখ দৈন্যের সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও,—সত্য রক্ষার জন্য, ঐ গচ্ছিত ধন আমি যথাপাত্রে প্রত্যর্পণ করিলাম; তখন অনুতাপের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার ভাব আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইল। আমি জানি আমি ভাল কাজ করিয়াছি; আমি জানি, আমি কোন কৃত্রিম মিথ্যা নিয়মের অনুসরণ করি নাই, কাল্পনিক নিয়মের অনুসরণ করি নাই, পরন্তু এমন একটা নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি যাহা সত্য, যাহা সার্ব্বভৌম, যাহা সমস্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন জীব মাত্রই অনুসরণ করিতে বাধ্য। আমি জানি, আমি আমার স্বাধীনতার সুব্যবহার করিয়াছি। এই স্বাধীনতার কার্য্য হইতে, আমার মনে একটা অপূর্ব্ব ভাব, একটা জয়োল্লাসের ভাব আবির্ভূত হয়। অনুতাপের পরিবর্ত্তে আমি একটা অনুপম আনন্দ অনুভব করি, এই আনন্দ আমার কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; আমার যদি আর কিছুই না থাকে, এই আনন্দ আমাকে সান্ত্বনা দিবে, আমাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবে। এই সুখের ভাবটি অনুতাপের মতই মর্ম্মস্পর্শী ও সুগভীর। সমস্ত উচ্চবৃত্তির সহিত বিদ্রোহ করিবার ফলে মানব হৃদয়ে যেমন অনুতাপ প্রসূত হয়, সেইরূপ সমস্ত উচ্চবৃত্তির চরিতার্থতায় এইরূপ আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হয়।

নৈতিক ভাব—সমস্ত নৈতিক বিচারক্রিয়া ও সমস্ত নৈতিক জীবনের প্রতিধ্বনি মাত্র। উহা প্রথমেই চখে পড়ে বলিয়া,

খুব তলাইয়া না দেখিলে,উহাই সমগ্র নীতির ভিত্তি বলিয়া সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিচারক্রিয়া ব্যতীত এই নৈতিক ভাব উৎপন্ন হয় না। ভাবটি নীতির মূলতত্ত্ব নহে, পরন্তু উহা মানসিক বিচারের পরিণাম; বিচারক্রিয়া নীতি নহে, পরন্তু বিচারক্রিয়া নৈতিক ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা—এইরূপ বুঝায়।

মানব-নীতিতন্ত্রের সমস্ত উপাদানগুলিই এখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; এখন এই প্রত্যেক উপাদানকে আমরা পৃথকরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

যে জটিল ব্যাপারটি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, তাহার মধ্যে নৈতিক ভাবটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর; কিন্তু এই নৈতিক ভাবের মূলে বিচারক্রিয়া অবস্থিত।

বিচার করিয়াই আমরা ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করি এবং বিচারক্রিয়াই সমস্ত ভালমন্দের মূলতত্ত্ব; কিন্তু সত্য ও সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার-সিদ্ধান্তের ন্যায়, মঙ্গল সম্বন্ধীয় বিচার-সিদ্ধান্তও মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার ক্রিয়ার মত, এই বিচার ক্রিয়াটিও সহজ, আদিম, মৌলিক, ও অবিশ্লেষ্য।

উহাদেরই মত, এই বিচারসিদ্ধান্তও আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে। কতকগুলি ক্রিয়া বিদ্যমানে, ঐ সম্বন্ধে আমরা একটা বিচারসিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারি না; সেই সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে ইহাও জানি, সেই বিচার-সিদ্ধান্তটাই ভাল মন্দের স্বরূপ নহে, পরন্তু ঐ বিচার-সিদ্ধান্ত কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহাই বলিয়া দেয় মাত্র। এই বিচার সিদ্ধান্তের দ্বারাই নৈতিক ভেদাভেদের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্ব যেমন দর্শকের নেত্র হইতে স্বতন্ত্র, যেমন সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যগুলি সত্যের প্রকাশক জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ মঙ্গলের বিচার-সিদ্ধান্তও মঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র।

(ক্রমশঃ)

মার্কস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

জগতের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার পূজাতেই আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটি কোন্ পদার্থ?—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে যেমন তুমি পূজা করিয়া থাক, সেইরূপ তোমার অন্তরের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকেও তোমার পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহা পরমদেবতারই কাছাকাছি। সেটি যে তোমার অন্তরের প্রভু, তোমার কার্য্য ও ভাগ্যের কর্ত্তা—তাহা তাহার কার্য্যগুণেই প্রকাশ পায়।

জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে,—কত শীঘ্র প্রকৃতির দৃশ্যসমূহ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবে। ভৌতিক জগৎ নিত্য নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনের কার্য্য চলিতেছে —কার্য্যকারণের মধ্য দিয়াই সেই পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহার কোন স্থায়িত্ব নাই। তাহার পর, আমাদের খুব নিকটেই, অতীত ও ভবিষ্যৎরূপ দুইটা রসাতল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—তাহার অভ্যন্তরে সমস্ত পদার্থ অন্তর্হিত হইতেছে। অতএব সে কি মূঢ় যে এই সমস্ত ক্ষণিক পদার্থের জন্য গর্ব্বিত হয়, উদ্বিগ্ন হয়, দুঃখিত হয়—হায়! যেন এই সমস্ত পদার্থ চিরকাল থাকিবে।

মনে রাখিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়

তুমি একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; তোমার ভাগ্যে যে কালাংশ পড়িয়াছে তাহারও কি অপরিমেয় স্বল্পতা, এবং অদৃষ্ট-রাজ্যের মধ্যেও তুমি কি নগণ্য!

তোমার দৈহিক অনুভূতিসমূহ প্রীতিজনকই হউক, বা অপ্রীতিজনকই হউক, তোমার অন্তরে যে কর্ত্তৃপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন—সেই সকল অনুভূতির সহিত যেন তাঁহার বিশেষ কোন সংস্রব না থাকে। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের অনুভূতি সেই সেই অংশের মধ্যেই বদ্ধ থাকুক; তোমার মন যেন তাহাদের হইতে তফাতে থাকে,—তাহাদের সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। এ কথা সত্য, সমবেদনার নিয়ম-প্রভাবে আমরা দেহের প্রত্যেক অংশের বেদনা ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকি; কেন না প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে অতিক্রম করা যায় না। তবে, দৈহিক অনুভূতি একেবারে নিবারণ করিতে না পারিলেও, উহাকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া কিংবা উহাকে আমাদের ভাল মন্দের প্রধান হেতু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে।

দেবতাদিগের সহিত আমাদের একত্র বাস করা উচিত। তিনিই দেবতাদিগের সহিত বাস করেন যিনি বিধাতার বিধানে নিত্য তুষ্ট এবং যিনি সেই অন্তর্দেবতার আজ্ঞা পালন করেন যে দেবতা বিধাতারই প্রতিনিধি ও ঈশ্বরের আত্মজ। এই দেবতা আর কেহই নহেন—ইনি সেই অন্তরাত্মা—সেই বিবেকবুদ্ধি যাহা সকলেরই আছে।

মনে করিয়া দেখিবে, দেবতাদিগের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, ভৃত্যের প্রতি তুমি বরাবর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। লোকে তোমার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারে কি না,—"ও ব্যক্তি কার্য্যে কিংবা বাক্যে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।" আরও মনে করিয়া দেখিবে, কি পরিমাণ কাজ তুমি করিয়াছ, এবং তাহা সমাধা করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট বল ও দৃঢ়তা ছিল কি না; তোমার কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে জানিবে। আরও মনে করিয়া দেখিবে, কত সুন্দর দৃশ্য তুমি দেখিয়াছ, কত সুখ দুঃখ তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, কত যশকীর্ত্তি তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, এবং অপকারী ব্যক্তির কত উপকার করিয়াছ।

তুমি শীঘ্রই ভস্ম ও কঙ্কালে পরিণত হইবে। পৃথিবীতে হয় ত তোমার নাম থাকিয়া যাইবে কিংবা যাইবে না। কিন্তু নাম জিনিস্‌টা কি? ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। তার পর, এ সংসারে যে সকল জিনিসের খুব আদর সে সমস্তই শূন্যগর্ভ, অসার, গলিত, ও অকিঞ্চিৎকর। ইহা কুকুরের হাড়-কাড়াকাড়ির মত; ইহা ছেলেদের খেলনা কাড়াকাড়ির মত—তাহারা পাইলে উৎফুল্ল হয়, আবার না পাইলে অশ্রুজলে ভাসে। তবে, এই পৃথিবীতে, কোন্ জিনিস্ তোমার অবলম্বন হইতে পারে? যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভাসমান ও পরিবর্ত্তনশীল হয়, যদি ইন্দ্রিয়গণ কুয়াসাচ্ছন্ন ও ভ্রম-প্রবণ হয়, যদি অন্তঃকরণ রক্তমাংসেরই রূপান্তরমাত্র হয়, এবং ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দাপ্রশংসা যদি নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস হয়—আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ হয়, তবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণবায়ু দেহ হইতে অপসারিত হইতেছে ততক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে একটু অপেক্ষা করিয়া থাক না কেন;—কিন্তু ততক্ষণ আমি কি করিব? ইহার

সহজ উত্তর এই—দেবতাদের পূজা কর, দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তন কর; মানুষের উপকার কর; এবং সকলের শেষে এই কথাটি মনে রাখিও, তোমার রক্তমাংস ও নিঃশ্বাসের বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা তোমার নহে, তোমার আয়ত্তাধীন নহে।

তুমি যদি কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ কর, এবং যদি তোমার চিন্তা ও কার্য্যকে সুপ্রণালীক্রমে নিয়োগ কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। ঈশ্বর, মনুষ্য ও জ্ঞানবান জীবমাত্রেরই অন্তরে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান;—একটি,—বাহ্য বিষয়ের বাধা না মানা; আর একটি—সাধুভাব ও সাধু কার্য্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখে না, উহারা আপনারাই পরম সন্তোষের হেতু—এই কথাটি উপলব্ধি কর।

মনুর উপদেশ।

আত্মার গুণত্রয়

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনোগুণাম্
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥

সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে। এই স্থাবর জঙ্গমরূপ সমস্ত পদার্থে এই তিনগুণ নিঃশেষে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে
সতদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণাম্॥

এই সকল গুণের মধ্যে যে গুণ দেহের মধ্যে সাকল্যে অধিক থাকে, সেইগুণ সেই দেহের দেহিকে তদ্‌গুণপ্রায় করিয়া থাকে।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজোস্মৃতম্
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥

সত্ত্বগুণে জ্ঞান, তমোগুণে অজ্ঞান রজোগুণে রাগদ্বেষ লক্ষিত হয়। সর্ব্বভূতাশ্রিত দেহ ব্যাপিয়া এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তত্রযৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥

আত্মাতে প্রীতিযুক্ত, শুদ্ধাভ, ও প্রশান্তবৎ কিঞ্চিৎ যাহা লক্ষিত হয় তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া অবধারিত করিবে।

যৎ তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ
তদ্রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারী দেহিনাম্॥

যাহা দুঃখসমাযুক্ত ও আত্মার অপ্রীতিকর এবং যাহা দেহিদিগের চিত্তহারী সেই অপ্রতিঘ অর্থাৎ দুর্নিবার গুণকে রজ বলিয়া জানিবে।

যৎ তু স্যান্মোহসংযুক্তংমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥

যাহা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অতর্কনীয় ও দুর্জ্ঞেয় তাহাকেই তম বলিয়া অবধারিত করিবে।

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধর্ম্মক্রিয়া আত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণ লক্ষণম্॥

বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা—এই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য।

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্য পরিগ্রহঃ
বিষয়োপসেবা রাজসং গুণলক্ষণম্॥

কার্য্যারম্ভে আসক্তি, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, বিষয়সেবা-ইহাই রজোগুণের লক্ষণ।

যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ ভবিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি
তদ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণ লক্ষণম্।

যে কর্ম্ম করিয়া ও যে কর্ম্ম করিবার সময়, এবং যে কর্ম্ম করিতে গেলে লজ্জা উপস্থিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে তমোগুণ-লক্ষণ বলিয়া জানেন।

যেনাস্মিন্ কর্ম্মনা লোকে খ্যাতি মিচ্ছতি পুষ্কলাম্
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥

ইহলোকে মহতী খ্যাতি প্রত্যাশায় যে কর্ম্ম করা হয় এবং যে কর্ম্মের অসমাপ্তিতে দুঃখানুভব হয় না, তাহাকে রজো বলিয়া জানিবে।

যৎসর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণ লক্ষণম্॥

যাহা সকলে জানিতে ইচ্ছা করে, যাহা করিয়া লজ্জিত হইতে হয় না, এবং যাহাতে আত্মতুষ্টি হয়, তাহা সত্ত্বগুণের কার্য্য জানিবে।

তমসো লক্ষণং কামো রজস্ত্বর্থ উচ্যতে
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্য মেষাং যথোত্তরম্॥

তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ, সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

PRAYERS.

XI.

O Supreme Spirit, sorely troubled by the sorrows, the passions and the turmoil of the world I look up to Thy lofty abode on high. Thou art kind to those that are humbled by affliction, and merciful to the poor in spirit. Vouchsafe Thy mercy unto me. Thy blessings descend even on those that see Thee not, nor want to know Thee. The veriest debauchee, who devotes himself entirely to the pursuit of pleasure and money-making, in utter forgetfulness of the world to come,—even he is at times awakened to a sense of his higher destiny in the presence of death,—death which Thou sendest as Thy messenger to bring him to his right senses. He regains momentary consciousness like a man in delirium and is then able perchance to catch a glimpse of Thee in the midst of the encircling darkness. There is none in all this world who has not need of Thee, who seeks not for Thy blessing. Savage people steeped in ignorance and superstition, as also civilized nations enjoying the light of knowledge, all—all have need of Thy help and protection. Who is there that does not bow down before Thee? Thou art the Lord of creation and monarch of all sentient beings: সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। Thou art the Ruler of all; Thou keepest all under the domination of Thy law—Thou maintainest all Thy creatures as their Monarch, their Governor, their Father and Mother, their Friend and Comrade. All pray to Thee with folded hands,—some pray for material gifts; others, burning with Divine fervour, pray to Thee for Thine own Self, as the crowning gift above everything else. Some pray to Thee for the enjoyment of paradise, others for the boon of salvation. Men are inspired to pray to Thee now by fear, now by hope. In some way or other all are impelled to come before Thy Throne. O Lord my God, how manifold are the forms in which Thy mercy is manifested. How wonderful is Thy loving kindness! My tongue refuses to give utterance to all that I feel. That mercy which I feel in my own insignificant life, the self-same mercy extends over the countless beings of Thy illimitable kingdom, and ministers to their diverse wants and aspirations. Thy mercy shows itself in the day and in the night, in the heart of the mother, and the inmost life of the Saint. O Lord, I call upon Thee with all my mind and all my heart—do Thou grant me all that may help me to worship Thee. Employ my hands in Thy work, speed my feet on Thy errands, engage my tongue in singing Thy glory, immerse my mind in Thy contemplation, and unite my soul with Thee; let my soul find rest by resting in Thee, may it be filled with the

light of Divine Wisdom. How wonderful it is that Thou, Merciful Lord, shouldst instanty grant my prayer. I behold Thee at this very moment in my soul. I see that Thou art without form or shape; that Thou art holy, true, and beautiful. It is by Thy ordinance that the Sun and the Moon exist, held up in space. By Thy ordinance the day and the night, the fortnight and the month, the seasons of the year come and go. By Thy ordinance the rivers flow down from snowy mountains, and speed on their courses towards the East and the West. Should a man spend his whole life in the performance of penances, and sacrificial and expiatory rites and ceremonies prescribed in the Shastras, yet know Thee not, fruitless will be his works. He who departs from the scene of this life without knowing Thee, is a pitiable creature, the lowest of the low; but he who quits this world after knowing Thee, is the true Brâhman. Blessed art Thou, O Lord of the Universe, blessed art Thou!

XII.

O Lord our God, Thou art so near us, yet why do we deem Thee to be far away? We take no pains to approach unto Thee, and therefore think in our foolishness that Thou regardest us not. Blind to our own supine indifference, we thoughtlessly cast reproach on Thy gracious Providence. Thou showest Thyself to us without fail whenever we long for Thee,—we seek Thee not, and therefore cannot find Thee. O God most high, may we seek Thee with all our heart, all our soul, and all our strength. —May we offer to Thee all our love. Be Thou, O Lord, graciously pleased to ordain that we may consecrate all our lives to Thy service.

XIII.

O Lord my God, illumine this our benighted Motherland. Cast Thy Look of grace on these Thy Children, who are so weak and helpless. Who else but Thou canst help this down-trodden land, which is begirt by endless troubles and calamities, and from which lamentations rise up to heaven day and night. Do Thou save our country from the depth of degradation into which it hath sunk. Send righteousness unto it, O Lord, for in righteousness is our salvation. On every soul do Thou pour down Thy waters of mercy, and reveal Thyself as our Father and our Mother, that we may worship Thee with our whole heart. Oh! when will that day dawn upon this land, when all her sons will unite in indissoluble brotherhood, and worship Thee with one accord. Our little efforts can accomplish nothing;—O Thou that crownest all work with success, grant us Thy grace.

Santih. Santih.

—

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মপূজা।

ভূমিকা।

ব্রহ্মপূজার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তাহা অগ্রে বলা আবশ্যক। অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্রহ্মপূজা চলিয়া আসিতেছে। আর্য্য ঋষিগণ যাগ, যজ্ঞ এবং ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা ছাড়িয়া, কেবল জ্ঞানদ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পরব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাগ, যজ্ঞ এবং ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা বৈদিককালে প্রচলিত ছিল। উপনিষদের সময়ে আর এক নূতন ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানযোগে, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের পবিত্র পূজা আরম্ভ হয়। নিভৃত স্থানে—অরণ্য মধ্যে—পর্ব্বতশিখরে উন্নতমনা ঋষিরা এই প্রকার পূজা অর্চ্চনা করিতেন। সুতরাং তাহা অল্পসংখ্যক সাধকের মধ্যে এবং অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ সে অমৃতের আস্বাদন পায় নাই। আদিমবাসী অসভ্য জাতির কথা দূরে থাকুক,

আর্য্যবংশীয় অপর সকলেও পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই রহিয়া গেল এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মপূজা হইতে বঞ্চিত রহিল। উক্ত উন্নতমনা ঋষিগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহারাই জ্ঞান ও ধর্ম্মের এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাই সমাজের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারাই সমাজের শাসনকর্ত্তা এবং বিধি-ব্যবস্থা-কর্ত্তা হইলেন। অপর সকলে শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইল এবং ক্রমে বেদ বেদান্ত এবং অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে অনধিকারী হইল। ক্রমে ব্রাহ্মণ শূদ্রে এতাধিক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-পূজা, জন সমাজ হইতে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। সেই কারণে ঐ সকল অজ্ঞ লোকের জন্য পরে পুরাণে তেত্রিশকোটী দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রকারে ভারতের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

পুরাণে কথিত আছে গঙ্গার বাসস্থান হিমালয় পর্ব্বতে ছিল। সগরবংশ উদ্ধারের জন্য, ভগীরথ সেই গঙ্গাকে সমতল দেশে আনয়ন করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বহু যুগ পরে সেইরূপ ভারতের উদ্ধার মানসে, ঐ ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং ব্রহ্ম-পূজা হিমাচল শিখর হইতে সাধারণ জনসমাজে আনিয়াছেন। সেই অবধি আমাদের দেশে এক নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। যে ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-পূজা অরণ্যে ও পর্ব্বতশিখরে অল্প-সংখ্যক ঋষিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাঁহার প্রসাদে এই ক্ষণে জাতিনির্ব্বিশেষে সকল নরনারী তাহার অধিকারী হইয়াছে। স্বর্গীয় রামমোহন এই প্রকারে ভারতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে বেদের কতকাংশ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করেন এবং এই রাজধানীতে ব্রহ্ম-সভা স্থাপিত করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ব্রহ্ম-পূজা আরম্ভ করেন। তাহা দেখিয়া লোকে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তাঁহার প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হইয়াছিল।

ব্রহ্মের কৃপায় সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই অগ্নির পরাক্রম দেশের লোককে স্তম্ভিত করে। কেবল স্তম্ভিত করিয়াছিল তাহা নহে। জনাকীর্ণ পল্লির কোনও একটি গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে, তাহা হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বায়ু-বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন গৃহান্তরকে প্রজ্বলিত করিয়া এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, রাজা রামমোহনের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মাগ্নি কালক্রমে দেশব্যাপ্ত হইয়া সেই প্রকার কাণ্ড উপস্থিত করিল। শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের আত্মাতে সেই অগ্নি প্রথমে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। সেই অগ্নি তাঁহার জীবনে কি প্রলয় আনয়ন করিয়াছিল, তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে রাজা তাঁহার পিতার নিকট সর্ব্বদা আসিতেন এবং নিজ ভবনে প্রত্যাগমন কালে কিশোর দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেই বয়সে তিনি রাজার সহিত এক গাড়িতে যাইবার সময় অবাক্ হইয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন এবং একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। রাজার জীবনান্তে তাঁহার অসম্পন্ন কার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করেন। বৈদিক কালে ঋষিরা যাগ যজ্ঞে একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতেন। পৌরাণিক সময়ে দুর্গোৎসবের কয়েক দিন একটি "জাগপ্রদীপ" দিবারাত্র জ্বালিয়া রাখার নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। মহর্ষি বুঝিলেন হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি একবার জ্বালিলে হইবে না। সেই অগ্নিকে চিরজীবন জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি ব্রহ্ম পূজার একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি করিলেন। নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা না করিলে, ব্রহ্মাগ্নি চিরজীবন জাগ্রত থাকিবে না। অন্ততঃ প্রাতে একবার এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার প্রার্থনা করিতে হইবে, দীক্ষার সময় দীক্ষার্থীকে এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিবার নিয়ম স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে তিনি একটি উপাসকমণ্ডলী গঠিত করেন।

কাল সহকারে মহর্ষির হৃদয়স্থিত ব্রহ্মাগ্নি অন্যান্য আত্মায় সংলগ্ন হইয়া এক অপূর্ব্ব ও অভিনব ব্যাপার সংঘটিত করিল। উক্ত উপাসকমণ্ডলীর মধ্য হইতে আর একজন দীপ্তশীর্ষ বহির্গত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া মহর্ষি বলিয়া উঠিলেন এতদিনের পর তিনি একজন বিশ্বাসী ও ব্রহ্মানুরাগী ব্রহ্ম-সন্তান পাইয়াছেন। তাঁহাকে তিনি "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মানন্দকে আচার্য্য পদে বরণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে বসাইলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে উভয়ের মধ্যে শোচনীয় বিচ্ছেদ ঘটিল। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কৈশোর হইতে উপাসনাশীল ছিলেন। ব্রহ্ম-পূজায় তাঁহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ এবং সেই পূজা হইতেই তাঁহার জীবনের ক্রমবিকাশ হইল। উপাসনা পদ্ধতিতে উদ্বোধনের পর আরাধনা আছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। ইহা আরাধনার মূল মন্ত্র। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মনে হইল এই মন্ত্রে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" যোগ করিয়া দিলে, আরাধনা পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্যের নিকট মনের এই ভাব প্রকাশ করিলে তিনি

সম্মতি প্রকাশ করেন এবং উহা উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই "ব্রহ্ম-পূজা" লিখিত হইল।

উদ্বোধন।

কেবল জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময় ব্রহ্মের পূজা অতীব দুরূহ। চঞ্চল-চিত্ত ও মোহ-মুগ্ধ মনুষ্যের পক্ষে অশরীরী চৈতন্য-স্বরূপে আত্মসমাধান করা বড় সহজ নহে। সাকার দেবতার পূজা ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ। সাকারবাদী আপনার ইষ্ট-দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া, পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়া অনায়াসে ভক্তিভরে পূজা অর্চ্চনা করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদীর পক্ষে সেই চৈতন্য-স্বরূপকে আপন শরীর-মন্দিরে, আত্মাসনে আসীন দেখিয়া এক-মাত্র জ্ঞান-যোগে, প্রীতি-পুষ্পকে ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। সুতরাং বিস্তর আয়োজন ও সাধনার প্রয়োজন। রামায়ণে কথিত আছে যে, রামচন্দ্র অকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া, পূর্ব্বে বোধন বসাইয়াছিলেন। মানুষ বিষয়াসক্ত, জড়-জগৎ লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত। ব্রহ্ম-পূজা সম্বন্ধে সকল সময়েই তাহার পক্ষে অকাল। সংসারাসক্ত, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত, মোহ মুগ্ধ মানবাত্মা সতত নির্জ্জীব ও অসাড় হইয়া থাকে। সংসারাসক্তি ও বিষয়চিন্তা হইতে অন্তত ব্রহ্ম-পূজার পূর্ব্বে তাহাকে বিমুক্ত রাখিতে হইবে। তাহার মৃতপ্রায় অসাড় আত্মাতে জীবন সঞ্চার করিতে হইবে। পাপচিন্তা ও সর্ব্বপ্রকার অসার ক্ষুদ্র চিন্তা হইতে তাহাকে বিরত করিতে হইবে। পবিত্র-স্বরূপ ব্রহ্মের পূজার জন্য তাহাকে শুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময়ের উপাসনা করিতে বসিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া, সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে আত্মার অন্তরাত্মা এবং প্রাণের প্রাণরূপে দেখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত বিধাতারূপে দেখিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। এই জন্য উপাসনার সময় উদ্বোধনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ কারণে ব্রহ্মোৎসবের পূর্ব্বে কয়েকদিবস ব্যাপী উদ্বোধনের ব্যবস্থা চাই। তাঁহার জন্য বিশেষভাবে আত্মা ও মনকে প্রস্তুত করা চাই। সাধু মহাত্মার কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা সকল অবস্থাতে ব্রহ্ম সত্তায় অবগাহন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকল সময়েই ব্রহ্ম পূজার জন্য প্রস্তুত।

আরাধনা।

উদ্বোধনের পর আরাধনা কি? উপাসক কোথায় কাহার সন্নিধানে এবং কি অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাই উপলব্ধি করা আরাধনার উদ্দেশ্য। কোন দূরস্থ অপরিচিত ও অনিশ্চিত দেবতার পূজা করিতে যাইতেছি না। যাঁহা অপেক্ষা সত্য পদার্থ আর কিছু হইতে পারে না; যিনি পূর্ণ সত্য; যাঁহার সত্তা মানবাত্মার অন্তর বাহির অধিকার করিয়া রহিয়াছে; যিনি জড় জগতে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে জাগ্রত জীবন্ত পুরুষ-রূপে প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছেন; যিনি জলে, স্থলে, শূন্যে সমান ভাবে জাগরূক; যিনি চন্দ্র সূর্য্যে গ্রহ নক্ষত্রে, মেঘ এবং বায়ুর মধ্যে তাহাদের শক্তি-রূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাদিগকে প্রশমিত ও পরিচালিত করিতেছেন; যিনি জনসমাজে ইতিহাসে ও জীবাত্মার অভ্যন্তরে বিধাতারূপে কার্য্য করিতেছেন; যিনি রোগে স্বাস্থ্যে, সম্পদে বিপদে জন্মে মৃত্যুতে এবং পরলোকে আশ্রয় ও বন্ধু, যিনি পাপের শাস্তা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, মুক্তি ও আনন্দ-দাতা, তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইয়াছি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। নচেৎ কোন্ দেবতার নিকট আসিয়া বসিয়াছি, কেমন প্রাণবন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিতে যাইতেছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এই কারণে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আরাধনার প্রয়োজন।

যিনি জ্ঞান-স্বরূপ—পূর্ণ জ্ঞান; যিনি মনুষ্যকে জ্ঞান দ্বারা বিভূষিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন; যিনি মনুষ্যকে অশেষ প্রকারে জ্ঞান বিজ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছেন; যিনি মানুষকে প্রীতি ভক্তি দ্বারা—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার পূজার অধিকার প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিয়াছেন; যিনি সর্ব্বজ্ঞ, মনের মন, যাঁহার নিকট কিছুই গোপন রাখিবার উপায় নাই; মানুষ যত কেন কপটাচারী ও ছদ্মবেশী হউক না, যাঁহার বিশ্বপ্রসারিত চক্ষু সকলই দেখিতেছে; গহন কাননে প্রবেশ করি, আর সমুদ্র-গর্ভে ডুবি, যেখানে চাই,—যাঁহার হাত ছাড়াইবার উপায় নাই—শর-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় যাঁহার নিকট একেবারে ধরা পড়িয়া আছি; ব্রহ্ম-পূজার সময় এই সমস্ত বুঝিতে হইবে। নতুবা পাপবোধ হইবে না, প্রাণের উৎস ছুটিবে না, প্রাণের কথা বাহির হইবে না এবং হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের জন্য প্রাণ-স্পর্শী প্রার্থনা আসিবে না। এই জন্য প্রকৃত পূজার পূর্ব্বে সেই জ্ঞান-স্বরূপের চিন্তা ও আরাধনার আবশ্যকতা।

ব্রহ্ম অনন্ত—অসীম। তিনি ভূমা, অগম্য ও অপার। ক্ষুদ্র মানবাত্মা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা ধারণ করিতে পারে না। তিনি তাহার পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। পূজার পূর্ব্বে এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখা চাই। কোথায় সেই অনন্ত দেবাধিদেব, আর কোথায় উপাসক, একটি ক্ষুদ্র অসহায় প্রাণী। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কত। কিন্তু তাহাতে কি? ব্রহ্মের ক্রোড় যে অনন্ত প্রসারিত। সকল নরনারী যে তাহাতে বাস করিতেছে, সেই অনন্ত ক্রোড় সকলকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। যত অমরাত্মা ইহলোক হইতে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে, যত আত্মা ইহলোকে মানবদেহে বদ্ধ রহিয়াছে, সকলই সেই ক্রোড় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ও অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। অহো! এ কি বিশাল ক্রোড়! পাপী পুণ্যাত্মা, ধনী দরিদ্র, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। তথায় কাহারও স্থানাভাব নাই। যুগ যুগান্তর সেই অমোঘ ক্রোড়ে সকলে বাস করিয়া নিরাপদ রহিয়াছে ও থাকিবে। তথায় থাকিয়া উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে ও করিবে—তাঁহার দিকে অনন্তকাল অগ্রসর হইয়া আনন্দের পর আনন্দ ভোগ করিবে। এ চিন্তা কি আশাপ্রদ!—এ আশা কি আরাম আনিয়া দেয়! এ চিন্তায় বিষয়-বিরাগ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আত্মীয় বিয়োগে শোকাশ্রু আর নিপতিত হয় না। উপাসক আপনার ও অপর সকলের অমরত্ব বুঝিয়া বীতশোক হয়েন, সেই অনন্তদেবের চরণ যুগল আরও জড়াইয়া ধরেন। ভীরু যে সে অভয় প্রাপ্ত হয়। দীন হীন কাঙ্গাল সকলে সেই বন্ধুর পদাশ্রয় লাভ করে। অনাথ যে সে সনাথ হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-পূজার সময় তাঁহার অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ মনন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম যেমন এক দিকে অগম্য অপার, অপর দিকে আবার তিনি আনন্দময় এবং অমৃতময়। মানুষ তাঁহার প্রিয় সন্তান হইয়া সেই আনন্দ ও অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। তিনি দুর্জ্ঞেয় ও অপার তাহাতে কি? তিনি যে জীবাত্মার পরম মাতা, পরম পিতা ও পরম সখা। তিনি যে এই লীলাভূমি সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আনিয়াছেন। মানুষ না থাকিলে তাঁহাকে জানবে কে? তাঁহার লীলা দেখিবে কে ও বুঝিবে কে? এবং দেখিয়া বুঝিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে কে? তাঁহার দত্ত আনন্দ ও অমৃত পান করিবে কে? মা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে কে? প্রাণ ভরে মা মা বলিয়া তাঁহার কোলে ঝাঁপাইবে কে? তাঁহার কোলে বসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিলে সেই স্নেহময়ী জননী অকাতরে নিজহস্তে অমৃত বিতরণ করেন। মানুষ তাহা পান করিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। অজ্ঞেয়বাদ দূরে পলায়ন করে। মায়ের কোলে ছেলে :বসিয়া মায়ের হাতে অমৃত পান করিতেছে, তাহাকে কুতর্কে ভুলায় কাহার সাধ্য! যদি মায়ের হাতের কঠিন আঘাতও পায়, সে বুক পাতিয়া অম্লানবদনে সহ্য করে। মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া সব জ্বালা ভুলিয়া যায়। তাহার পাপ তাপ দূরে চলিয়া যায়। তখন সে বলিতে থাকে মা তুমি আনন্দরূপমমৃতং। উপাসককে সেই জন্য প্রার্থনার পূর্ব্বে সেই অমৃত স্বরূপের ভাবনা করিতে হয়। এই স্বরূপ ভাবনা ও আরাধনাতে বড়ই আনন্দ পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। তিনি শান্তিদাতা মঙ্গলদাতা ও অদ্বিতীয়। মানুষের আর কেহ নাই, যে তাহাকে শান্তি ও কল্যাণ দিতে পারে। মানুষের আর কেহ নাই যে পাপ তাপ হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারে। ব্রহ্মই একমাত্র পরিত্রাতা ও মঙ্গল বিধাতা এবং সংসার পারাবারের কাণ্ডারী। তিনি ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নাই; তিনিই তাহার একমাত্র পরম গতি, তিনিই তাহার একমাত্র পরম সম্পদ, তিনিই তাহার একমাত্র পরম লোক ও পরম আনন্দ। এ দুঃখময় সংসার অশান্তিতে পরিপূর্ণ। এখানে পদে পদে বিপদ, শোকতাপ ও জ্বালা যন্ত্রণা। এখানে মানুষ পাপে তাপে জর্জ্জরিত। সম্মুখে প্রলোভন বিস্তর। অথচ সে অতি দুর্ব্বল। পাপই যত অকল্যাণ আনয়ন করে। সেই মঙ্গলময় বিধাতার প্রসন্ন মুখ দেখিয়াই মানুষ সকল পাপ তাপ, শোক ভয় এবং প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাঁহাকে ছাড়িয়া মানুষ আর কোথায় কাহার নিকট যাইবে? সেই অদ্বিতীয়কে প্রতি আত্মা যখন আপনাতে পূর্ণ ভাবে দেখিতে থাকে, তখন তাঁহার একত্বের ও বহুত্বের সমন্বয় বুঝিতে পারে। তিনি এক অথচ বহু এই কথার মর্ম্ম তখন হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-পূজার সময় তাঁহার "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" স্বরূপের আরাধনা বিশেষ কল্যাণকর।

তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" তিনি শুদ্ধ, পবিত্র-স্বরূপ—পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্মরাজ। শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। ন্যায়-দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া তিনি এই সমগ্র জগৎ শাসন করিতেছেন। তিনি পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান করিতেছেন। মানুষ তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইলে, তাহার পাপ তাপ ভস্মীভূত হইয়া গিয়া তাহার আত্মা ও মন পরিশুদ্ধ হয়। পাপ লইয়া মানুষ তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারে না। সেই পবিত্র-স্বরূপের সংস্পর্শে তাহার আত্মা পাপধৌত হইয়া তাঁহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে। সেই অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, পাপ হৃদয়ের ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। সেইজন্য উপাসক আরাধনা অন্তে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানে নিযুক্ত হয়েন।

ধ্যান।

কাহার নিকট কি উদ্দেশে আসিয়াছি যখন উপলব্ধ হইল এবং উপাস্য দেবতার স্বরূপ হৃদ্গত হইল, তখন পরমাত্মাতে আত্ম-সমাধানের শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। বিষয় কোলাহল ও সংসারচিন্তা হইতে আত্মা প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসাগরে উপাসক অবগাহন করিয়া রহিয়াছেন। এখন প্রাণারামকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখা সহজ হইয়া পড়িল। সকল ব্যবধান অন্তর্হিত, এখন সাধকের জ্ঞানচক্ষু ও সেই চৈতন্য-স্বরূপের চক্ষু এক হইয়া গেল। এখন জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন হইল। এখন

মায়ের কোলে বসিয়া জীবাত্মা যোগ-সুধা ও প্রেমামৃত পান করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের জন্য হইলেও, তাহাতেই জীবন পবিত্র হইয়া যায়। সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য মানুষ ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান হয়। ব্রহ্ম-কৃপা বর্ষিত হইয়া সাধককে নবজীবন প্রদান করে। ইহাই যোগ। এই সময়ে সাধক ব্রহ্মের নিজ মুখের বাণী শুনিতে পান। সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সাধু বচন ও মহাত্মাদের সত্য উপদেশ বাক্য, স্বয়ং ব্রহ্মের সাক্ষ্যবাক্যে সপ্রমাণিত হয়। সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সাধকের বিশ্বাস এই প্রকারে দৃঢ়তর হয়। কাহারও সাধ্য নাই সে বিশ্বাসকে শিথিল করিতে পারে, বা উল্টাইতে পারে।

প্রার্থনা।

এইক্ষণে প্রার্থনার উপযুক্ত কাল উপস্থিত। কোনও অনুপস্থিত অথবা দূরস্থ ব্রহ্মের উপাসনায় কিছুই ফল হয় না। সেই জন্য যখন তাঁহাকে আত্মার আসনে বসাইয়াছি—তাঁহাকে আত্মার অন্তরাত্মা-রূপে উপলব্ধি করিতেছি—যৎকালে তিনি করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, তখনই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা কি? প্রার্থনার অর্থ যাচ্ঞা—ভিক্ষা। প্রার্থনার কোন বিশেষ ভাষা নাই এবং আবশ্যকও করে না। তাহা আত্মার একটি ভাব মাত্র। ধ্যানে ব্রহ্মকে ধরিয়া আপন আত্মাকে তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করা হইয়াছে। এখন জীবাত্মা নিজের অভাব সকল নিজে বুঝিয়া, পরমাত্মার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়াছে। আর কিছুই করিতে হইবে না। তিনি সকলই দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, সুতরাং অবশিষ্ট তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন। আত্মার দুর্ব্বলতা, পাপ তাপ, মোহ মায়া তাঁহার চরণতলে রাখিয়া দিলে প্রতিবিধান তিনিই করিবেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? অনেকে বলেন অন্তর্যামী ভগবান সকলই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, তবে আবার যাচ্ঞা ও ভিক্ষা কেন? জড় দেহের পক্ষে পান আহার যেরূপ অত্যাবশ্যক, ব্রহ্ম-কৃপা ও ব্রহ্ম-বল আত্মা সম্বন্ধে সেই প্রকার। পান আহার ব্যতীত শরীরে বলাধান হইয়া প্রাণরক্ষা হয় না। ব্রহ্ম-কৃপা ও ব্রহ্ম-বল ভিন্ন আত্মা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। মানবাত্মা সসীম, সুতরাং দুর্ব্বল। পৃথিবী বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভনে পরিপূর্ণ। স্বয়ং ব্রহ্মই তাহার সহায়, সখা ও বল। সাধারণ মানুষ সংসার-সাগরে হাবুডুবু খায় এবং অনেকে আধ্যাত্মিক প্রাণ হারায়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান, ব্রহ্মকে যাঁহারা সহায় করিতে পারিয়াছেন এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা অন্য প্রকার। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা না থাকিলে খাইবে কে? অন্ন পানকে জীর্ণ করিয়া দেহে বলবিধান করিবে কে? আত্মার পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। অগ্রে আপনার অভাব বুঝা আবশ্যক—পাপ বোধ হওয়া প্রয়োজন। ইহাই আত্মার ক্ষুৎপিপাসা। তাহার পর আর কিছুই করিতে হইবে না। শিশুর ক্ষুধা পাইলে, আহারের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। মাতা অমনই আহার পান দেন। শিশুকে ক্রন্দন করিতে কেহ শিখাইয়া দেয় না। ক্ষুধা পাইলে সে কাঁদিবেই কাঁদিবে। পাপ বোধ হইলে ও আপনার আধ্যাত্মিক অভাব বুঝিতে পারিলে, ব্যাকুল প্রাণে কাতর প্রার্থনা মানবাত্মায় আপনা হইতে আইসে। প্রার্থনা করিতে কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। ভগবান মানুষকে জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। সে আপন অভাব বুঝিয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিবে। ক্রন্দন শুনিয়া পরমজননী আহার পান না দিয়া থাকিতে পারেন না। ব্যাকুলতা না দেখিলে তিনি মুক্ত-হস্ত হয়েন না, ইহাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম।

প্রার্থনার বিষয় কি? মানুষ ভগবানের নিকট কি ভিক্ষা করিবে? বিষয়-সুখের জন্য, ধনের জন্য, যশের জন্য অথবা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রথমতঃ জড় ও আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এ দুই রাজ্যের বিধি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। জড়-রাজ্যের নিয়ম প্রতিপালন করিলে, জড়-অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিলে আধ্যাত্মিক কামনা পরিতৃপ্ত হইবে। শরীর রক্ষার নিয়ম অবলম্বন কর, স্বাস্থ্য পাইবে। ধনোপার্জ্জনের পন্থা অনুসরণ করিলে ধন লাভ হয়। অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া অথবা বিষপান করিয়া ভগবানকে ডাকিলে প্রাণ রক্ষা হইবে না। শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ জন্য উপযুক্ত পান আহার আবশ্যক। তাহাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা চাই। প্রার্থনায় সে উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে। আত্মার পাপ, তাপ, মোহ দুর্ব্বলতা অপনয়ন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে প্রার্থনা চাই। আত্মার উন্নতি কল্পে সংযম সাধনা ও প্রার্থনাই ব্যায়াম। দ্বিতীয়তঃ, মানবাত্মার চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম-লাভ এবং তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ ও শান্তি-সুখ উপভোগ। বিষয়-কামনায় তৃপ্তি ও বিষয়-সুখ লাভের জন্য প্রার্থনা করিলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। বিষয়-সুখ লক্ষ্য হইলে ব্রহ্মকে তৎসমুদায় লাভের উপায়-স্বরূপ করা হয়। আধ্যাত্মিক চক্রের কেন্দ্র অথবা নাভি, ব্রহ্ম। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও সংসার অর-স্বরূপ। এই সমস্তই ঐ কেন্দ্র বা নাভিতে অর্পিত থাকিবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা শর স্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম-লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে। অতএব ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-সুখের জন্য হইতেই পারে না। কেবল পারমার্থিক সুখ শান্তির উদ্দেশেই তাহা প্রধাবিত হওয়া উচিত। "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম। অন্য দেবতা অথবা পুত্তলিকা সে স্থান অধিকার করিবে না। জ্ঞানাভিমানী ব্রহ্মবাদী কাষ্ঠ লোষ্ট্র নির্ম্মিত পুত্তলিকার পূজা পরিহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবাত্মার আরও অনেক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পুত্তলিকা আছে, যাহাদিগকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রস্তর বা ধাতু নির্ম্মিত দেবতার পূজা ত্যাগ করা অতি সহজ, কিন্তু আধ্যাত্মিক পুত্তলিকা সকল অতিশয় দুষ্পরিহার্য্য।

প্রার্থনার ফল। প্রার্থনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে

চলিবে না। প্রার্থনার ফল লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যাজ্ঞা করিলাম, কিন্তু উত্তর পাইলাম কি? যতক্ষণ উত্তর না পাইব ততক্ষণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিব না। প্রাণস্পর্শী ভিক্ষা করিলে—হৃদয় খুলিয়া ডাকের মত ডাকিতে পারিলে, উত্তর নিশ্চয় আসিবে। উত্তর যাহা আসিবে, সেই ব্রহ্ম-আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবার অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকিবে। তবে প্রার্থনার ফল লাভ হইবে—তবে ব্রহ্ম পূজা সার্থক হইবে।

শেষ।

বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ নিতান্ত উপকারী। সাধু সজ্জনেরা আজীবন সাধন-ভজনের দ্বারা যে সকল সত্য ও জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা পাঠ এবং আপন জীবনে প্রতিফলিত করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। উপাসনা অন্তে শাস্ত্র হইতে পাঠ ও শান্তিবচন দ্বারা পূজা সমাপ্ত করিতে হয়। ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ এবং কৃপা ভিন্ন পূজা ফলবান হয় না। ব্রহ্মকৃপাই অসহায় মানুষের একমাত্র সম্বল। ব্রহ্ম-কৃপাই ভব-সমুদ্র পার হইবার এক মাত্র তরণী। সেই জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবার নিয়ম হইয়াছে।

নানা কথা।

তিব্বত।—তিব্বতের আভ্যন্তরীণ সংবাদ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ঐ স্থান অসংখ্য উচ্চঅঙ্গের যোগী ও তপস্বীর নিবাসস্থল বলিয়া সাধারণের অন্তরে বহুকাল ব্যাপী একটি ধারণা চলিয়া আসিতেছে। বিগত অভিযানে অনেক গূঢ় রহস্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই তিব্বতে মঠের সংখ্যা নিতান্ত অধিক। এক একটি মঠ অসংখ্য সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দান করে। Gyantse গিয়াংসির দুর্ভেদ্য প্রাচীরাবৃত মঠে ৬০০ সন্ন্যাসীর থাকিবার স্থান আছে। দ্বারদেশে সন্ন্যাস জীবনের বিধিগুলি লিখিত। যাহারা শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের নাম "তপ"। বিভিন্ন শ্রেণীর বৌদ্ধগণের বিভিন্ন শিক্ষালয়, বিভিন্ন ভজনমন্দির একই প্রাঙ্গনের ভিতরে অবস্থিত। অদূরে "জীবন-চক্র" অঙ্কিত। যমরাজ নরকের ভিতরে বসিয়া তৌলদণ্ড হস্তে মনুষ্যের আত্মার সহিত তাহার কার্য্যাকার্য্য ওজন করিতেছেন। স্বর্গের চিত্রে 'কল্পবৃক্ষ' রহিয়াছে; পুণ্যবান যখন যাহা চাহিতেছেন, তখনই তাহা পূর্ণ হইতেছে। সভাগৃহে দিবারাত্র ধরিয়া ঘৃত-প্রদীপ জলিতেছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও দেব-দানবের মূর্ত্তি দেওয়ালে অঙ্কিত। বুদ্ধ-পদ-চিহ্নে অষ্টমঙ্গল রহিয়াছে। উহা বিভিন্ন আটটি দ্রব্যের সমষ্টি। ১। বিজয়-চক্র—রাজ্যের বিজয়চক্র যাহার উপর সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না। ২। সৌভাগ্য-চক্র—যাহা তিব্বতীয়গণ বুদ্ধের নাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, প্রকৃত পক্ষে যাহা অসংখ্য জন্মের ও কষ্টভোগের পরিচায়ক। ৩। পদ্ম—যাহা স্বর্গীয় জীবনের পরিচায়ক। ৪। অমৃত-কলস—যাহা অমর-জীবনের পরিচায়ক। ৫। সুবর্ণমৎস্যদ্বয়—যাহা সৌভাগ্য সূচক। ৬। ছত্র—যাহা রাজচিহ্ন। ৭। শঙ্খ—যাহা বিজয়-ভেরী। ৮। পতাকা বাবৈজয়ন্তী যাহা বিজয় সূচক। (বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত অষ্ট-মঙ্গল যাহা দুর্গোৎসব পদ্ধতিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যবিধ, যথা "মৃগরাজো বৃষো-নাগঃ কলসোব্যজনস্তথা, বৈজয়ন্তী তথা ভেরী দীপ ইত্যষ্ট মঙ্গলং। বৌদ্ধ অষ্টমঙ্গল ও পুরাণোক্ত অষ্টমঙ্গলের কোন কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে মাত্র)। ভজন-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে ভারতীয় সংস্কৃত-গ্রন্থ হইতে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদিত শতসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ ও আড়াই শত খণ্ড টীকা রহিয়াছে। প্রতি খণ্ড পুঁথি আকারে আড়াই ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চ চৌড়া; ওজনে ৫ হইতে পোনের সের। সমস্তই কাষ্ঠ-ফলকে বাঁধা রহিয়াছে। অধিকাংশই হস্তলিখিত। "প্রজ্ঞা পারমিত" গ্রন্থ সুবর্ণাক্ষরে লিখিত। অধিকাংশ পুস্তক প্রায়ই উদ্‌ঘাটিত বা পঠিত হয় না। যে কয়েক খানি পঠিত হয়, তাহা রোগ-প্রশমন ও সৌভাগ্য-লাভের মন্ত্রে পরিপূরিত। বসন্তকালে ঐ পুস্তক-গুলি সসম্মানে মস্তকে ধারণ করিয়া লামাগণ শস্যক্ষেত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে, কখন বা রোগীর শয্যা ও তাহার আবাস-নিকেতনের চারিদিকে মহা সমারোহে ঘুরিয়া আইসে। পীড়িত লোকের রোগ-আরোগ্য কামনায় কখন কখন বহুসংখ্যক লামার সমাবেশ হয়। অসংখ্য প্রদীপ জলিয়া উঠে। মন্দিরের ভিতরে বসিয়া সমস্বরে লামাগণ গান করিতে থাকেন। ধূপের বাষ্পে চারিদিক পরিপূরিত হয়। সে দৃশ্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। একটি স্তম্ভে চাবুক ঝুলিতেছে, সেই কশাঘাতে অপরাধী নবীন লামার চৈতন্য সম্পাদিত হয়। কুত্রাপি অনেকগুলি পুস্তকের সমাবেশ রহিয়াছে। তৎসমস্তই প্রায় ইতিহাসমূলক; মঠের ও লামাগণের ও রাজার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহার উপরে এতই ধুলি নিপতিত রহিয়াছে, যে কখন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লামাগণের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর। কুড়ি জনের ভিতরে একজন পড়িতে পারেন কি না, সন্দেহ। লামাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পদ্মদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বুদ্ধদেব অপেক্ষা তাঁহার সম্মান সমধিক বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন গৃহ মূল্যবান উপকরণে সুসজ্জিত। একটি কক্ষে ভূতের মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া যাত্রীগণ সন্ত্রাসিত হয়েন। উহার দেহ মনুষ্যের মত, কিন্তু মুখ ও মস্তক ভীষণ-জন্তুর সদৃশ। বিষ ও তাম্রকূট তাহার সেবার জন্য সম্মুখে প্রদত্ত হয়। মনে হয় ঐরূপ কল্পনা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব-আমলের। অদূরে গান্ধোলা মন্দির, (Gandhola) গয়ার মন্দিরের আদর্শে বিনির্ম্মিত (যেখানে শাক্যমুনি আলোক লাভ করিয়া বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন)। এখান হইতে ৩ মাইল দূরে বিংশ-কক্ষ-সমন্বিত একটি আশ্রম আছে, যেখানে বসিয়া লামাগণ মধ্যে মধ্যে সমাধিমগ্ন হয়েন। দুই মাইল দূরে ত্রিশ জন স্ত্রী-সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। অদূরে Golgotha* যেখান হইতে মৃতদেহ নিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় ও শৃগাল

কুক্কুর গৃধিনী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। কাষ্ঠের অল্পতা হেতু সম্ভবতঃ মৃতদেহের পরিণাম এইরূপ ঘটে। কেবলমাত্র লামার এবং বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত লোকের দেহ ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। Thechen নামক স্থানে দুই হাজার সাধু থাকিবার আশ্রম আছে। সম্ভবতঃ উহা ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত।

পত্র। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মপরিবারের একটি তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার সংকল্প যে সাধু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সহানুভূতি-কারী মহোদয়গণ সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

কতগুলি ব্রাহ্ম-পরিবার ভারতবর্ষের মধ্যে আছে, তাহার একটা তালিকা এবং প্রত্যেক পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমার একটা প্রবল ইচ্ছা অনেক দিন ধরিয়া আছে। কোন কোন বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদেরও ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, আমি একমাস যাবত কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম-বন্ধু সকলের বাটীতে যাইয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় তিন শত পরিবারের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে। আর ও অনেক পরিবার কলিকাতায় আছেন। প্রতি দিনই সংগ্রহ করিতেছি। এক্ষণে কাগজ ছাপাইয়া মফঃসলের ব্রাহ্ম-বন্ধু সকলের নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং ছাপার কাগজ দ্বারা ভালরূপ খাতা বাঁধাইয়া এই সকল বিবরণ রক্ষা করিতে হইবে।

এই কার্য্যের জন্য আমি তিন সমাজের ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহানুভূতি, অর্থ-সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আনুমানিক হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছি, ৫০০০ হাজার কাগজ ছাপাইয়া আড়াই হাজার কিম্বা তিন হাজার কাগজ দ্বারা একখানা বাইণ্ডিং করা খাতা করিতে হইবে। এই খাতার মধ্যে বিবরণ লেখা থাকিবে। অবশিষ্ট অৰ্দ্ধেক কাগজ মফঃস্বলে পাঠাইয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ অনুমতি করেন, তবে তিন সমাজের মিসন-আফিসে তিন খানা খাতাও রাখিতে প্রস্তুত আছি। এই কার্য্যে সাহায্য করিলে বাধিত হইব। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতাস্থ তিন সমাজের মিসন আফিসে ম্যানেজারের নিকট সহানুভূতি-সূচক পত্র ও অর্থ-সাহায্য পাঠাইবেন। একখানা খাতা থাকিলে ৫০০০ হাজার ছাপার ফরমের আবশ্যক। তিন খানা খাতা থাকিলে ৩০০০ হাজার হিসাবে ৯০০০ হাজার এবং মফঃসলের জন্য দুই হাজার, মোট ১১০০০ হাজার ফরম ছাপাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বাইণ্ডিং খরচ ও মফঃস্বলের জন্য ডাক খরচ লাগিবে।

নিবেদক
শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।
৭নং গিরীশ বিদ্যারত্নের লেন
বা
৮৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১০৫৮॥১০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩২৮৪॥৶০
সমষ্টি	...	৪৩৪৩ ৶১০
ব্যয়	...	৭৭৪ /১
স্থিত	...	৩৫৬৯৶৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৬৯৶৯
৩৫৬৯৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৫৬৮৸৪

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
৪০০৲
কোম্পানীর কাগজের সুদ
১৬৮৸৪
৫৬৮৸৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬২।০
পুস্তকালয়	...	৩০।/০
যন্ত্রালয়	...	৩৩৯৸৶৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫৭।০
সমষ্টি	...	১০৫৮॥১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩৫৸৶৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৩॥৶৬
পুস্তকালয়	...	৪॥৶০
যন্ত্রালয়	...	২২১।৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১৪৮।৶৯
সমষ্টি	...	৭৭৪/১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।
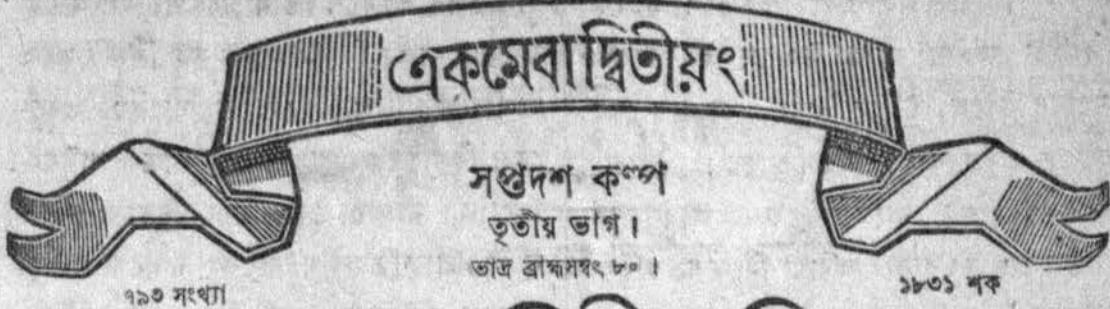
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আকাশের বিদ্যুৎ।

বায়ুর ব্যাপকতা বুঝাইতে হইলে আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলি,—মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীসকল যেমন জলের ভিতরে ডুবিয়া থাকিয়া চলা ফেরা করে, আমরা সেই প্রকার বায়ুসাগরের মধ্যেই ডুবিয়া আছি। এই উপমাটিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদি বলা যায়,—সমগ্র সসাগরা পৃথিবী তাহার নগর বন এবং মরুপ্রান্তরাদি বক্ষে করিয়া সর্ব্বদা বিদ্যুৎ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তবে বোধ হয় কথাটা ঠিকই বলা হয়।

বায়ুর স্পর্শ আমরা নিয়তই অনুভব করি এবং প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসেও সে নিজের অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়া দেয়। বিদ্যুতের অস্তিত্ব এপ্রকার সুস্পষ্ট না হইলেও, মেঘ-নির্ঘোষ এবং বিদ্যুৎ-স্ফুরণে তাহার অস্তিত্ব জানিতে বাকি থাকে না।

কেবল মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ হয় না। যখন আকাশ সম্পূর্ণ মেঘনির্ম্মুক্ত এবং বায়ুও জলীয়বাষ্প বর্জ্জিত থাকে, সেই সময়েও আকাশে বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাইবিরিয়া এবং আমেরিকার শুষ্ক প্রান্তরের বায়ুরাশি সময়ে সময়ে এপ্রকার বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া পড়ে যে তখন পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ আপনা হইতেই বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

লর্ড কেল্‌ভিন্ আকাশের বিদ্যুৎ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বায়ুতে যে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ বর্ত্তমান, তাহা ঐসকল পরীক্ষায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। আজকাল ইলেক্ট্রোমিটার (Electrometer) নামক যে একপ্রকার বিদ্যুৎমাপক-যন্ত্র পরীক্ষাগার মাত্রেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দ্বারাও বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝা যায়। আকাশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল স্থির করা হইতেছে এবং বিদ্যুতের পরিমাণ দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মোটামুটিভাবে পূর্ব্বে গণনা করিয়া রাখা হইতেছে।

আকাশের বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে তিন চারিটি কারণের উল্লেখ দেখা

যায়। পৃথিবীর জল এবং স্থলভাগ হইতে নিয়তই জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে। সূর্য্যের তাপে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহ হইতে প্রচুর বাষ্প বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিকে আকাশের বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তা'ছাড়া বায়ুর স্তরগুলি এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সূর্য্যের তাপে যে অসমভাবে উত্তপ্ত হয়, তাহাকেও বিদ্যুৎ-উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বিদ্যুৎ-উৎপত্তির এই কারণগুলির কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু কথাগুলির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য বহুচেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। এই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আজকাল বিদ্যুতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কতকগুলি নূতন কথা শুনা যাইতেছে। আশা হইতেছে সম্ভবতঃ আকাশের বিদ্যুতের গোড়ার খবরটা এ গুলির সাহায্যে শীঘ্র জানা যাইবে।

কয়েক বৎসর হইল দুইজন অষ্ট্রীয়ান্ বৈজ্ঞানিক আল্‌প্‌স সন্নিহিত প্রদেশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষাক্ষেত্রটি একটি ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। এই স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাঁহারা অপর বৈজ্ঞানিকদিগকে ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেনার্ড সাহেব (Herr Lenard) এই সময়ে বিদ্যুতের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সংবাদটি কর্ণগোচর হইলে সুইজার্ল্যাণ্ডের পর্ব্বতময় প্রদেশে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিকটেই দুই তিনটি বৃহৎ জলপ্রপাত ছিল। লেনার্ড সাহেব এখানেও বিদ্যুতের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কোন নূতন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সম্মুখে রাখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাহার মূলতত্ত্বটির আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহাদের সাধনার বিরাম থাকে না। লেনার্ড সাহেব এই নূতন বৈদ্যুতিক ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ইহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে দীর্ঘ সাধনার ফলে পরীক্ষাক্ষেত্রের জলপ্রপাতগুলিকেই তিনি বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ জলপ্রপাত বা সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের মোটেই আবশ্যক হয় না। ক্ষুদ্র জলপ্রপাতগুলিও যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারে।

জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থান যে বিদ্যুৎপূর্ণ থাকে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে দুই একজন তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যানে বলিলেন, —আকাশের বায়ুতে সাধারণতঃ যে বিদ্যুৎ থাকে, তাহাই ঝরণার সন্নিহিত জলকণাপূর্ণ বায়ুতে বিপরীতজাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চয় (Induction) আরম্ভ করে। ইহারই ফলে আমরা ঐ সকল স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাই।

লেনার্ড সাহেব বহু অনুসন্ধান করিয়াও পূর্ব্বোক্ত কথাটির সত্যতা দেখিতে পান নাই। ইনি বলিতেছেন, জল বাষ্পীভূত হইলে, বা জলবিন্দুগুলি সবেগে বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলে

অতি অল্প বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। প্রপাতের ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলি পর্ব্বতের গাত্রে বা শিলাতলে পড়িয়া ছিন্ন হইতে থাকিলে যে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তাহারই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। লেনার্ড সাহেবের মতে, আকাশের অধিকাংশ বিদ্যুৎই জলকণার ঐ প্রকার ভাঙাগড়া হইতে উৎপন্ন।

পরীক্ষাশালায় এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃত্রিম জলপ্রপাত রচনা করিয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই জলবিন্দুগুলির বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিদ্যুৎ দেখা দিয়াছিল।

ধূলিহীন পরিষ্কার বায়ুর ভিতরে পিচ্‌কারি দ্বারা বার বার জলধারা চালনা করিতে থাকিলে, বায়ু বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর হইল লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এবং অধ্যাপক ম্যাক্‌লিন্‌ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেনার্ড সাহেবের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহারও একটি ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। বায়ুর ভিতর দিয়া যাইবার সময় জলধারা যখন সহস্র সহস্র জলকণায় পরিণত হইয়া পড়ে, তখনই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য যে, কেবল জলপ্রপাতের ধারাই বিদ্যুতের উৎপাদন করে না। নদী সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ের তরঙ্গমালার সহিত কূলের সংঘর্ষণ এবং বৃষ্টির জলবিন্দুগুলির সহিত ভূমির সংঘাত প্রভৃতি নানা ব্যাপার বায়ুতে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ জোগাইতেছে। এমন কি সহরের রাস্তায় এবং বাগিচার গাছগুলির উপরে আমরা যখন জলসেচন করি, তখন এই সকল কার্য্য দ্বারাও আমাদের অলক্ষ্যে এক একটু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে।

ক্ষুদ্র জলবিন্দু ক্ষুদ্রতর হইয়া ছড়িয়া পড়িলে কেন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমে লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানেরই আলোচনা করিব। ইনি প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় দুই জাতীয় বিদ্যুতের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন, এবং তার পর প্রত্যেক জলবিন্দুকে ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (negative) এই দুই বিদ্যুতের দুইটি পৃথক আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রকার জলবিন্দু যখন কঠিন মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ঋণাত্মক-বিদ্যুতের বহিরাবরণটা ছিন্ন হইয়া বায়ুকে বিদ্যুৎপূর্ণ করে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানটি সহজ হইলেও প্রকৃত ব্যাপারটি যে এত সহজে সম্পন্ন হয় না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত টমসন্‌ সাহেব (Prof. J. J. Thomson) বিষয়টির আলোচনা করিয়া ঠিক এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, কোন জিনিসে শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই শক্তি অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাপ এবং বিদ্যুৎ-প্রভৃতিতে পরিণত হয় সত্য, কিন্তু জলবিন্দু ভাঙ্গিয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাহাকে শক্তির প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের ফল বলা যায় না। জলধারাকে কেবল বায়ুর ভিতর দিয়া না চালাইয়া নানাজাতীয় বাষ্পের মধ্যদিয়া প্রবাহিত করায় অধ্যাপক টমসন্‌ বিদ্যুতের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহিত নিশ্চয়ই রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। জলীয় বাষ্পপূর্ণ পাত্রের ভিতর দিয়া জলধারা প্রবাহিত করিলে

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জলীয় বাষ্পের স্থানে বায়ু বা অপর কোন বাষ্প রাখিলেই বিদ্যুৎ দেখা দেয়। ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্ মিশ্রিত জলের প্রবাহ চালাইয়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্লোরিনের স্থানে হাইড্রোজেন্ বাষ্প প্রবেশ করাইবামাত্র বিদ্যুতের সঞ্চয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার বিবরণ পাঠ করিলে, আকাশের বিদ্যুৎ-উৎপত্তির সহিত যে রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক টম্‌সন্ তাঁহার পরীক্ষাগুলি দ্বারা রাসায়নিক কার্য্যের লক্ষণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যগুলি কি প্রকারে চলে তিনি তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন।

যে সকল পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন বিসদৃশ, তাহাদেরই মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের কার্য্য প্রবলভাবে চলে। এটি রাসায়নিক কার্য্যের একটা গোড়ার কথা। ক্লোরিন্ এবং আয়োডিন্ প্রভৃতি জিনিস গুলির রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন। তাই ইহাদিগকে একত্র রাখিলে কেন রাসায়নিক কার্য্য দেখা যায় না। কিন্তু হাইড্রোজেনের ন্যায় আর একটি পৃথক্‌ধর্ম্মী জিনিসের সহিত সেই ক্লোরিন্ ও আয়োডিন্‌কে মিশাইলে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক টমসন্ পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জল এবং বায়ুর রাসায়নিক প্রকৃতির মধ্যে কোন মিল নাই। এইজন্য জলবিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম কণিকাগুলি যখন বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করে, তখন আপনা হইতেই রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতেরও উৎপত্তি দেখা যায়। জলীয় বাষ্প এবং জলবিন্দুর রাসায়নিক প্রকৃতি মূলে এক। এই কারণে টমসন্ সাহেব জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়া জলধারার উৎক্ষেপ করিয়া বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিতে পান নাই; এবং পরে ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্ মিশ্রিত জলধারা চালনা করায় বিদ্যুৎ জন্মায় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণ জলবিন্দু যখন বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া আসে, তখন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। সেই জলবিন্দুই যখন কোন প্রকারে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলকণিকায় পরিণত হইয়া বায়ুর ভিতর দিয়া নামিতে থাকে কেবল তখনই বিদ্যুৎ জন্মায়। অধ্যাপক টমসন্ এই ব্যাপার সম্বন্ধেও কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। কোন কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থের অণু যখন অণুর (molecules) আকারে থাকে, তখন তাহা বিদ্যুৎকে বহন করিতে পারে না। বিদ্যুৎ বহন করিয়া অপর পদার্থে দিতে হইলে পরমাণুর (Atoms) সাহায্য প্রয়োজন। এইজন্য কোন বিদ্যুৎযুক্ত বায়বীয় পদার্থের অন্তত কতক অংশ ভাঙিয়া চূরিয়া পরমাণুর আকার গ্রহণ না করিলে সেই বস্তু হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হয় না। অধ্যাপক টমসন্ এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জলবিন্দুসকল সূক্ষ্ম জলকণিকার আকার গ্রহণ করিলে, অণুর ভাঙা-গড়া ব্যাপারটি অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে থাকে; এবং তার পর ইহার সহিত বায়ুর নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেনের ভাঙাগড়া যোগ দিলে, বিদ্যুতের পরিমাণ প্রচুর হইয়া দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎস্ফুরণ এবং বজ্রপাত প্রভৃতি বৈদ্যুতিক ঘটনার সহিত আমাদের খুব

ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের গোড়ার খবরটি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম না। আকাশের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে গেলে যে, রাসায়নিক কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারি নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাকৃতিক কার্য্যগুলি সর্ব্বদাই কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল পরস্পরের সাহায্যেই যে, এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, আকাশের বিদ্যুৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের অসম্পূর্ণ স্থূল দৃষ্টি প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে বলিয়াই আমরা জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমার উপলব্ধি করিতে পারি না। সকলই যেন ছাড়া ছাড়া ভাবে আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। অথচ আমরা যে সকল ঘটনাকে বিপরীত এবং অসম্বদ্ধ বলি, তাহাদেরও তলে সর্ব্বদাই যোগসূত্র বর্ত্তমান। জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সম্পর্কিত অসম্পর্কিত ঘটনাগুলির মধ্যে যোগ-সাধন করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই বিজ্ঞানালোচনা সার্থক হইবে, এবং মানব ধন্য হইবে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

মানব কার্য্যের ভাল-মন্দ বাস্তব-লক্ষণ যুক্ত,—যদিও ঐ সকল লক্ষণ চক্ষের দ্বারাও দর্শন করা যায় না, হস্তের দ্বারাও স্পর্শ করা যায় না। কোন কার্য্যের ভৌতিক গুণের সহিত তাহার নৈতিক গুণকে একীভূত করা যায় না বলিয়া সেই নৈতিক গুণ যে কম নিশ্চিত তাহা নহে। এইজন্যই, যে সকল কার্য্য ভৌতিক হিসাবে সমান, তাহা নৈতিক হিসাবে খুবই ভিন্ন। হত্যা সকল সময়েই হত্যা; তথাপি, অনেক সময়, উহা মহাপরাধ হইলেও বৈধকার্য্যরূপে পরিগণিত হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—যখন হত্যার সহিত প্রতিশোধ লইবার ভাব না থাকে, স্বার্থের সংস্রব না থাকে, যখন শুধু আত্মরক্ষণের জন্যই হত্যাকার্য্য সাধিত হয়, তখন সে হত্যা বৈধ হত্যা। রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয় না, নির্দ্দোষীর রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয়। নির্দ্দোষিতা ও অপরাধ, ভাল ও মন্দ,—চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট অমুক অমুক বাহ্য অবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করে না। বাহ্য-রূপ বিভিন্ন হইলেও, বাহ্য অবস্থা কখন সমান কখনও অসমান হইলেও, উহার মধ্য হইতে নির্দ্দোষিতা ও অপরাধকে, ভাল ও মন্দকে, জ্ঞান ঠিক চিনিয়া লইতে পারে।

আমাদের মনে হয়, ভাল মন্দ যেন সব সময়েই বিশেষ বিশেষ কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত; কিন্তু সেই সব কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বের দরুণ সেই সব কার্য্য আসলে ভাল কিংবা মন্দ নহে। তাই, আমরা যখন বলি, সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডটা অতীব অন্যায় এবং লেওনিডাসের আত্মবলিদান অতীব প্রশংসনীয়, তখন আমরা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যায় মৃত্যুদণ্ডকেই দূষণীয় মনে করি, এবং একজন বীরের আত্মোৎসর্গকেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি;—সেই বীরের নাম লেওনিডাসই হউক কিংবা Assas হউক, সেই জ্ঞানীর নাম সক্রেটিসই হউক কিংবা Barllyই হউক, তাহতে কিছুই আসিয়া যায় না।

আমাদের ভাল-মন্দসংক্রান্ত বিচার-

ক্রিয়া প্রথমে বিশেষ বিশেষ কার্য্যেই প্রযুক্ত হয় এবং সেই বিচারক্রিয়া হইতেই কতকগুলি সাধারণ মূলতত্ত্ব প্রসূত হয়, —যাহা পরে সদৃশ কার্য্য সকল বিচার করিবার সময়ে বিচারের নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। যেমন অমুকটির অমুক কারণ ইহা বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার পরে আমরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, সেইরূপ আমরা বিশেষ বিশেষ কার্য্যসম্বন্ধে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত করি, তাহাই আমাদের নৈতিক বিষয়সংক্রান্ত বিচারের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। তাই প্রথমে আমরা লেওনিডাসের মৃত্যুর প্রশংসা করি; পরে তাহা হইতেই এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া ভাল। লেওনিডাসের সম্বন্ধে যখন এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম তখনও এই সিদ্ধান্তটি আমাদের জানা ছিল, তাহা না হইলে এই বিশেষ স্থলে উহার প্রয়োগ অবৈধ হইত, এমন কি, উহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইত না, পরন্তু ঐ বিশেষ প্রয়োগের সহিত ঐ সাধারণ সিদ্ধান্তটি জড়িত ছিল। পরে যখন এই সাধারণ সিদ্ধান্তটি বিশেষ হইতে আপনাকে বিনির্মুক্ত করিল, সার্ব্বভৌম ও অবিমিশ্র আকারে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইল, তখন ঐ সিদ্ধান্তকে আমরা সদৃশ স্থলে প্রয়োগ করিতে লাগিলাম।

অন্য বিজ্ঞানের ন্যায়, নীতিশাস্ত্রেরও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র আছে; সকল ভাষাতেই এই সকল মূলসূত্র ন্যায্যরূপ নৈতিক সত্যরূপে অভিহিত হইয়া থাকে।

শপথ ভঙ্গ করা উচিত নহে ইহাওএকটি সত্য। বস্তুতঃ শপথ রক্ষা করা সত্যের মধ্যেই ধর্ত্তব্য এবং এই উদ্দেশেই বিচারালয়ে শপথ করান হয়। নৈতিক সত্যগুলি, সত্যের হিসাবে গাণিতিক সত্য হইতে কম নিশ্চিত নহে। গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণাটা যদি গোড়ায় ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি,—যেমন ত্রিকোণের ধারণার সহিত এই তত্ত্বটি সংযুক্ত থাকে যে, উহার তিন কোণ উহার দুই ঋজু কোণের সমান, সেইরূপ গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণার সহিত এই ধারণাটি সংযুক্ত থাকে কি না যে, বিশ্বাসভঙ্গ না করিয়া ঐ গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। তুমি ইচ্ছা করিলে এই গচ্ছিত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে পার; কিন্তু এই বিশ্বাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, তুমি সত্যকে উল্টাইতে পার এরূপ মনে করিও না; কিংবা ইহাও মনে করিও না যে গচ্ছিত বস্তু কখনও নিজস্ব হইতে পারে। এই দুই ধারণা পরস্পরকে খণ্ডন করে। গচ্ছিত দ্রব্য নিজস্ব-রূপে ব্যবহার করিলে, উহা স্বামিত্বের সাদৃশ্য ধারণ করে মাত্র, কিন্তু আসলে উহাতে স্বামিত্ব বর্ত্তায় না; প্রবৃত্তির আবেগ যতই হউক না, স্বার্থের মিথ্যা জল্পনা উহার সমর্থনে যতই চেষ্টা করুক না, উহাদের মধ্যে যে স্বরূপগত ভেদ আছে তাহা কখনই উল্টাইতে পারিবে না। এই জন্যই নৈতিক সত্য এরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অন্য সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্যও—যাহা আছে তাহাই আছে; কাহারও খেয়ালে উহা একটুও এদিক ওদিক হয় না।

অন্য সত্যের সহিত নৈতিক সত্যের বিশেষত্ব এইটুকু ঃ—নৈতিক সত্য যখনই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তখনই আচরণের নিয়মরূপে উহা আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়। যদি এ কথা সত্য হয় যে, যথার্থ অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, তাহা

হইলে সেই দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে। বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতার সহিত এস্থলে কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা সংযোজিত হইয়াছে। কার্য্যের যে এই অবশ্যম্ভাবিতা—ইহাই কর্ত্তব্যতা। যে নৈতিক সত্যসমূহ, জ্ঞানের চক্ষে অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ইচ্ছার নিকট কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ইচ্ছা তাহা করিতে বাধ্য। যে নৈতিক সত্য কর্ত্তব্যের মূলীভূত, সেই নৈতিক সত্যের ন্যায় নৈতিক কর্ত্তব্যও, স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ অনন্যাপেক্ষ। যেমন অবশ্যম্ভাবী সত্যগুলি, ন্যূনাধিকরূপে অবশ্যম্ভাবী নহে, সেইরূপ নৈতিক কর্ত্তব্যও ন্যূনাধিক পরিমাণে কর্ত্তব্য নহে। বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে গুরু লঘুতার ধাপ আছে সত্য, কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তব্যতার মধ্যে ওরূপ কোন ধাপ নাই। কোন স্থলেই "প্রায় কর্ত্তব্য" এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না, কর্ত্তব্য কিংবা কর্ত্তব্য নহে—ইহার মাঝামাঝি কিছু নাই।

যদি কর্ত্তব্যতা স্বয়ংসিদ্ধ হয়—তাহা হইলে উহা অপরিবর্ত্তনীয় ও সার্ব্বভৌম। কারণ, যদি আজিকার কর্ত্তব্য কল্যকার কর্ত্তব্য হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বয়ং কর্ত্তব্যতার মধ্যেই একটা প্রভেদ আসিয়া পড়ে,—তাহা হইলে কর্ত্তব্যকে আপেক্ষিক ও আগন্তুক বলিতে হয়।

কর্ত্তব্যের এই স্বয়ংসিদ্ধতা, অপরিবর্ত্তনীয়তা, সার্ব্বভৌমতা এত নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট যে, স্বার্থবাদীরা উহাকে তিমিরাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, আধুনিক তত্ত্ববিদ্যা-জগতের একজন গভীর নীতিবেত্তা, কর্ত্তব্যের উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; তাঁহার বিবেচনায় ঐ গুলিই সমগ্র নীতির মূলতত্ত্ব। যে স্বার্থ কর্ত্তব্যকে ধ্বংস করে এবং যে ভাবরস কর্ত্তব্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, ঐ উভয় হইতেই Kant কর্ত্তব্যকে পৃথক্ করিয়া কর্ত্তব্যের প্রকৃত লক্ষণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। Helvetius এর যুগে তিনি কর্ত্তব্যের পবিত্র নিয়ম পর্য্যন্ত উত্থান করিয়া কর্ত্তব্যের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তিনি যথেষ্ট উচ্চে ওঠেন নাই ;—তিনি কর্ত্তব্যের মূল তত্ত্বে উপনীত হন নাই।

Kant-এর মতে, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই ভাল, তাহাই মঙ্গল। কিন্তু যুক্তির নিয়মানুসারে,—কোন কার্য্য স্বতঃ ভাল না হইলে, সেই কার্য্য সাধন করিবার অবশ্যতা কোথা হইতে আসিবে? কোন গচ্ছিত বস্তু নিজস্ব—এই কথা আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলিয়াই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপরাধের কার্য্য হয় নাই কি? যদি কোন কার্য্য উচিত এবং কোন কার্য্য অনুচিত হয়, তাহা হইলে এই দুই কাজের মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ অবশ্যই আছে। ভালোর উপর অবশ্যতা স্থাপন না করিয়া অবশ্যতার উপর ভালোকে স্থাপন করাও যা—কারণকে কার্য্যরূপে গ্রহণ করাও তা', কার্য্য হইতে কারণকে বাহির করাও তা'।

যদি কোন সজ্জনকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নিজের দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও সে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিল না কেন? সে উত্তর করিবে :—আত্মসাৎ না করাই তাহার কর্ত্তব্য। তাহার পরেও যদি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কিজন্য ইহা তাহার কর্ত্তব্য, সে এই প্রশ্নের উত্তরে এই কথা আমাকে বেশ বলিতে পারে :—কারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত কাজ, ভাল কাজ। ঐখানে আসিয়াই সমস্ত উত্তর থামিয়া যায়। ঐখানে সমস্ত প্রশ্নও থামিয়া যায়। এ কথা যখনই স্বীকার করা হয়,—যাহা

আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহা ন্যায়বুদ্ধি হইতে প্রসূত, তখনই মন পরিতুষ্ট হয়। কারণ উহা এমন একটা মূলতত্ত্বে আসিয়া পৌঁছোয় যাহার ও-দিকে আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই;— কারণ, ন্যায় আপনই আপনার মূলতত্ত্ব। ন্যায়ের সহযোগেই নৈতিক সত্যগুলির সত্যতা নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভাল ও মন্দ প্রকাশ পায় সেই ভাল ও মন্দের মূলগত প্রভেদটি কি ?—না, ন্যায়। এই ন্যায়ই ধর্ম্মনীতির সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব।

ন্যায়—কোন কারণের কার্য্য নহে, কেন না, উহা অপেক্ষা উচ্চতর মূলতত্ত্বে আরোহণ করা অসম্ভব। খুব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, কর্ত্তব্য মূলতত্ত্ব নহে, কারণ কর্ত্তব্যের উপরেও আর একটি মূলতত্ত্ব আছে, যাহা কর্ত্তব্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার উপর কর্ত্তব্যের প্রামাণিকতা নির্ভর করে— সে কি ?—না, ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

মার্কস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

শুধু তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও, আর কিছুর জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। শীত হউক, গ্রীষ্ম হউক, লোকে তোমায় ভাল বলুক, মন্দ বলুক, কিছুরই জন্য চিন্তা করিও না; এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করিও না। জানিবে, জীবনকে ত্যাগ করাও জীবনের একটা কাজ; বর্ত্তমান কালের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

সকল বস্তু তলাইয়া দেখিবে; কোন জিনিসের আসল গুণটি যেন তোমার দৃষ্টিকে এড়াইয়া না যায়।

কোন অনিষ্টাচরণের অনুকরণ না করাই প্রতিশোধ লইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জগতে যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই একজন জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের দ্বারাই হইতেছে। এই বিশ্ব-কারণের অন্য কোন সহকারী নাই; কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে—আর কোন মূলতত্ত্ব আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে নাই।

হয় এই জগৎ কতকগুলা পরমাণুর সমষ্টি—যদৃচ্ছাক্রমে একবার মিশিতেছে, আবার পৃথক হইয়া পড়িতেছে; নয় এই জগৎ সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত নিয়মের অধীন। যদি পূর্ব্বোক্ত কথাই ঠিক্ হয়, তবে কি জন্য আমি এমন জগতে থাকিতে যাই যেখানে এরূপ বিশৃঙ্খলা এবং যেখানে সমস্ত পদার্থ এরূপ অন্ধভাবে একত্র মিশ্রিত হইয়াছে; তবে, যত শীঘ্র পারি পঞ্চভূতের সঙ্গে পুনর্ব্বার মিশিয়া যাওয়া ছাড়া আমার আর কিসের ভাবনা ? তবে আর কিসের জন্য আমি এত কষ্ট পাই ? যাই আমি করি না কেন, আমার পঞ্চভূত ত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইবেই। কিন্তু জগতের যদি কোন বিধাতা পুরুষ থাকেন,—তবে সেই জগতের মহান্ নিয়ন্তা ও শাসয়িতাকে আমি পূজা করিব, এবং তাঁহারই আশ্রয়ে নিশ্চিন্তমনে ও প্রফুল্লচিত্তে জীবন যাপন করিব।

কোন প্রতিকূল ঘটনা তোমার চিত্তকে বিচলিত করিবামাত্র—তুমি তোমার অন্তরের জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিবে, প্রয়োজন না হইলে সেখান হইতে একপাও বাহির হইবে না; সেখানে গেলে,সে ঘটনা তোমার নিকট আর বেসুরা বলিয়া ঠেকিবে না— আবার সামঞ্জস্য লাভ করিয়া উহা তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিবে।

এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ কর, যদি তোমার

সৎমা ও মা উভয়ই থাকেন, তুমি তোমার সৎমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, কিন্তু মার সঙ্গেই তোমার বেশী কথাবার্ত্তা হয়। সংসার ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ; সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের নিকট থাকিয়াই তুমি বেশী আরাম ও আনন্দ লাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মজীবন যাপন করিলেই সংসার তোমার নিকট সহনীয় হইবে, তুমিও সংসারের নিকট সহনীয় হইবে।

যখন কোন আমিষ-ব্যঞ্জন আমাদের নিকট আনীত হয়—তখন আমরা যেন মনে করি, ইহা একটা মৎস্যের মৃত শরীর, ইহা একটা পাখীর মৃত শরীর, এবং অন্যটি শূকরের মৃত শরীর; এই যে মদ্য—ইহা কতকগুলা আঙ্গুরকে পিষিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এই যে আমার রাজপরিচ্ছদ—ইহা মেষের কতকগুলা লোম পাকাইয়া শামুকের রক্ত দিয়া রঞ্জিত। এইরূপ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখের সামগ্রীর কথা যদি ভাবিয়া দেখি ত দেখিব, উহারা ঐরূপ স্থূল উপাদানেই নির্ম্মিত; এবং এই ধারণাটিকে যেন আমাদের জীবনের সমস্ত বাহ্যাড়ম্বরে আমরা প্রয়োগ করি। যখন কোন বস্তুর বাহ্য চাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ হই তখন তাহাকে যেন আমরা পরোখ করিয়া দেখি; যে সকল বাক্য তাহাকে সপ্তমস্বর্গে উত্তোলন করে সেই বাক্যাবরণটা তাহা হইতে খসাইয়া ফেলিলেই তাহার অসারতা উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, বাহ্যরূপ ও আকারে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হয়। বাহ্যরূপের ন্যায় প্রবঞ্চক আর দ্বিতীয় নাই। যখনই কোন পার্থিব পদার্থে মুগ্ধ হইবে, তখনই জানিবে তুমি প্রবঞ্চিত হইয়াছ।

যদি দেখ, কোন একটা বিষয় খুবই কঠিন, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ করিও না যে, কেহই উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। যদি বিষয়টা যথোপযুক্ত হয় এবং আর কোন ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য হয়, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও—উহা তোমারও সাধ্যায়ত্ত।

আমার ভুল যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি হৃষ্টচিত্তে আমার মত পরিবর্ত্তন করিব। কেন না, আমার কাজ—সত্যানুসন্ধান করা; এ পর্য্যন্ত সত্যের দ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও ভ্রমকেই ধরিয়া থাকে, তাহারই অনিষ্ট হয়।

আমি আমার কর্ত্তব্য করিতেছি—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আর কোন বিষয়ের জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইব না।

মনুর উপদেশ।

গায়ত্রীমন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরংতপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥

একাক্ষর প্রণবই পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্মপ্রতিপাদক; প্রাণায়ামই পরম তপস্যা; সাবিত্রীর পর আর মন্ত্র নাই এবং মৌন হইতে সত্যই বিশিষ্ট। ("মৌন হইতে সত্যই বিশিষ্ট" এ কথা এ স্থলে বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই হইতে পারে—মৌন হইয়া গায়ত্রীমন্ত্রকে গুপ্ত রাখা অপেক্ষা প্রকাশ করাই ভাল—কেন না উহা সত্য।)

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ
অক্ষরন্ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।

বৈদিক হোম-যাগাদি সমুদয় ক্রিয়ারই ক্ষরণ হয় অর্থাৎ ক্ষয় হয়, কিন্তু অক্ষর অর্থাৎ এই যে প্রণব-অক্ষর ওঁ, ইহা অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয় হয় না; এবং ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃস্মৃতঃ॥

বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জপযজ্ঞ অর্থাৎ গায়ত্রীমন্ত্র জপ দশগুণে বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। জপ-যজ্ঞের মধ্যে উপাংশু জপ (যে জপ-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া সমীপস্থ লোককর্ত্তৃকও শ্রুত হয় না) শতগুণে বিশিষ্ট, উপাংশু হইতে আবার মানস জপ (অর্থাৎ মনে মনে জপ) সহস্রগুণে বিশিষ্ট। (শূদ্রাদি শুনিবে বলিয়া নহে, মানস-জপে জপের একাগ্রতা ও গাঢ়তা বৃদ্ধি পায় বলিয়া। অনেকের ধারণা, উচ্চৈঃস্বরে সকলের সমক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ; তাহা যদি হইত, এখানে এই তিন প্রকার গায়ত্রী জপের উল্লেখ করা হইত না। তবে, মানস জপ সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ এইমাত্র ইহাতে বলা হইয়াছে।)

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞ সমন্বিতা।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

বিধিযজ্ঞসমন্বিত এই যে চারিটি মহাযজ্ঞ (দেব, ভূত, মনুষ্য ও পিতৃযজ্ঞ)—এই সমস্ত যজ্ঞের পুণ্যফল, ব্রহ্মযজ্ঞরূপ এই জপ-যজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও এক ভাগ হয় না।

জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদ্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

বৈদিক কার্য্য করুন আর নাই করুন, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপবলে সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাতে আর সংশয় নাই—ব্রাহ্মণ, মৈত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। (মৈত্র কি না, সর্ব্বভূতের মিত্র; ভাবার্থ এই,—যেহেতু অন্য বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় জপযজ্ঞে পশুবধের বিধি নাই, অতএব, মৈত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে জপযজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, যে সময়ে মনুসংহিতা সংকলিত হয়, সেই সময়ে প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞের প্রতি একটু বৈমুখ্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পরি লক্ষিত হয়।)

মৃত্যুভয়—মৃত্যুঞ্জয়।

(আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে)

আপনারা যুধিষ্ঠির ও যক্ষের গল্প শুনিয়া থাকিবেন। যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিল, তার মধ্যে এই এক প্রশ্ন ছিল যে, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমিতঃপরং।

প্রতি মুহূর্ত্তে কত কত লোক যমমন্দিরে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি অন্যেরা স্থিরত্ব ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে?

আশ্চর্য্য বটে কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে যদি মৃত্যুর বিভীষিকা অনুক্ষণ আমাদের চক্ষের সামনে থাকে, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হয়? আপনার জন্যই হোক্, পরের জন্যই হোক্, কোন কর্ম্মে কি আমাদের প্রবৃত্তি থাকে? মৃত্যুভয়ে শশব্যস্ত থাকিয়া আমরা উদাসীন বীর্য্যহীন নিশ্চেষ্ট অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। আমরা যে মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখি না, এই অন্ধতা হইতেই আমাদের রক্ষা। মৃত্যু যেমন হইবেই নিশ্চয়, আবার তার মধ্যে একটু অনিশ্চিৎ ভাব ও আছে, কোন্ সময়ে আসে তার স্থিরতা নাই—সেই ভরসায় আমরা জীবন ধারণ করি—হাঁসিয়া খেলিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই। যদি কোন গণৎকার গণিয়া বলিতে পারে যে, তোমার অমুক দিনে মৃত্যু হইবে, আর তার কথায় আমার ধ্রুব-বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে আমার দশা কি হয়? জীবনের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া কি নির্ব্বীর্য্য নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ি না?

তেমনি আবার মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া থাকাতেও দোষ। যা সত্য—যা

অবশ্যম্ভাবী তার প্রতি অন্ধ থাকিলে আমাদের সেই শশকের দশা হয়, যে শিকারী আসিতেছে দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া মনে করে এখন আর কোন ভয় নাই। যা সত্য তা আমার হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্, সেটা জেনে রাখা—মনে রাখা কর্ত্তব্য। আসল কথা মৃত্যুকে কখনো বা স্মরণ করা—কখনো বা ভুলিয়া থাকা—এ দুইই চাই, যেমন আমাদের শাস্ত্রে আছে

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিত্তামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবার সময় মনে করিবে আমি অজর, অমর, আর ধর্ম্ম আচরণ করিবার সময় ভাবিবে যেন মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করিতেছে।

মৃত্যু এক হিসাবে আমাদের পরম হিতকারী বন্ধু, যে যখন আমরা মোহনিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়ি, তখন সে ঘুমঘোর হইতে আমাদিগকে জাগাইয়া তোলে। আমরা অহর্নিশ বিষয়-চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছি, উচ্চ-আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভাবিবার একটুকু অবকাশও পাই না, এ অবস্থায় মৃত্যু হইতেই আমাদের চেতনা হয়। যখন আহার বিহার বিলাসিতার মধ্যেই জীবন ক্ষেপণ করি, তখন মৃত্যু উপহাস করিয়া বলে—

"কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে?"

যখন আমরা সম্পদে স্ফীত হইয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করি, আপনাকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়া আর সকলকে কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করি, তখন মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

যখন আমরা অর্থোপার্জ্জনকে জীবনের সার জানিয়া জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, তখন মৃত্যু বলিয়া দেয়—

"কিন্তু দেখ মনে ভেবে কেহ সঙ্গে নাহি যাবে
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর।"

এই জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-প্রলোভন হইতে মুক্ত করিয়া বৈরাগ্যের দিকে হাত ধরিয়া লইয়া যায়, এমন বন্ধু মৃত্যুর মত আর কে আছে? সহস্র উপদেশ, অশেষ শাস্ত্রালোচনায় যাহা না হয়, এক মৃত্যু তাহা এক মুহূর্ত্তে শিখাইয়া দেয়। মৃত্যুর নিকট লোকবিচার, জাতিবিচার নাই। আমরা এখানে ধনমদে মত্ত থাকি, আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াই। যে বলী সে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, যার উচ্চকুলে জন্ম সে নীচ জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু মৃত্যুর কাছে কোন ভেদাভেদ নাই; রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। এক সময় আসে যখন রাজার রাজদণ্ড তার হাত হইতে ভূতলে খসিয়া পড়ে—যখন জাতি কুলের মান মর্য্যাদা ধূলির সহিত মিশিয়া যায়, যখন অন্যায় অত্যাচার ভয়ে কম্পমান্, তখন মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকে না; সকলকেই সেই জরা বার্দ্ধক্য আক্রমণ করে—সেই মৃত্যু আসিয়া সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

আমরা জীবদ্দশায় বিষয়-মোহে মুগ্ধ থাকিয়া অনেকবার আপনাদের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাই—মৃত্যু তাহা অব্যর্থরূপে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা এখানে পাপাচরণ করিয়াও অনেক সময় আত্মগ্লানি ভোগ করি না। আমোদ প্রমোদ বিষয়-কোলাহলের মধ্যে আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকি। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! এমন এক সময় আসিবে, যখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তার জীবন্ত মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে উদয় হইবে। আপনার বিচারাসনে আপনাকেই সাক্ষ্য দিতে হইবে। যে ব্যক্তি কোন একটা বিশেষ পাপ পোষণ করিতেছে—কোন নিরপরাধীকে অকারণে উৎপীড়ন করিয়াছে, অন্যায়পূর্ব্বক কাহারো

ধন হরণ করিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণ সূচি-বিদ্ধ হইতে থাকিবে। তাহা ছাড়াও আমাদের সমুদয় জীবনের একটা চিত্র সে সময় মনোমধ্যে উদয় হইবে—সময়ের কত অপব্যয় করিয়াছি, আলস্য প্রমাদে জীবন ব্যর্থ ক্ষেপণ করিয়াছি, আত্মোন্নতির কত সুযোগ অবহেলা করিয়াছি—আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে মত্ত থাকিয়া পরের জন্য—দেশের জন্য কিছুই করি নাই—কত প্রকার কুৎসিত কার্য্যে আপনার জীবনকে কলুষিত করিয়াছি—যদি কোন সময় এই সকল চিন্তায় মনোবেদনা উপস্থিত হয়, সে সেই সময় যখন মৃত্যু আসিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিচারাসনে আমাদিগকে লইয়া যাইবে।

এই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মিলে মরিতে হবে—যার জন্ম তার মৃত্যু—এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যেই জীবন। এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যত দিন চলিতে পারি তত দিন জীবিত থাকি, এই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ক্ষয় ও মৃত্যু। জীবনের লক্ষণ পুষ্টি, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার; আর ক্ষয় অসাড়তা নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুর লক্ষণ। এক সময় আসিবে যখন আমার এই হাত অসাড় হইয়া পড়িবে—এই পা চলৎশক্তি রহিত হইবে—বাক্য নীরব হইবে—হৃদয়ের ধুকধুকানি থামিয়া যাইবে, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। এই মৃত্যু যদি অপরিহার্য্য, তবে কেন আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করি? তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথম—জিজীবিষা—বাঁচিবার ইচ্ছা। আমরা হাজার দুঃখ কষ্টে পড়ি, এই জীবনের মায়া কাটানো দুঃসাধ্য। চিররোগী যে রোগশয্যায় দিনপাত করিতেছে, অন্ধ খঞ্জ বধির পৃথিবীর সঙ্গে যার সম্বন্ধ প্রায় সমস্ত লোপাপত্তি হইয়াছে, ভিখারী যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কষ্ট স্রষ্টে দিনযাপন করিতেছে—তাহাদের কেহই এই হত জীবিত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত নহে। ঈসপের কাটুরিয়ার গল্প জানেন। সে বোঝার ভারে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া মৃত্যুকে ডাকিতে লাগিল। যখন যমরাজ সত্যই তার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? তখন কাটুরিয়া বলিল 'বাবা! তোমাকে ডেকেছি যে এই বোঝাটা আমার মাথায় উঠাইয়া দিবে।' আমাদের জীবনের মায়া এমনই প্রবল যে তাহা ছাড়িবার যে কষ্ট, তার সহিত অন্য কোন কষ্টের তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়—বিচ্ছেদ। বিষয় ত্যাগ, প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ। যে প্রণয়ীর ক্ষণকালের বিরহে তুমি অধৈর্য্য হইয়া পড়, মৃত্যুর শাসনে তাহার সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটিবে। তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী পরিজন, তোমার চিরসঞ্চিত ধন রত্ন, অশ্ব-রথ গজ-শোভিত প্রমোদভবন,—এ সকলি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যাহা তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনই ছাড়িতে পার না—মৃত্যু তাহা বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে হরণ করিয়া লইবে। কি ভয়ানক কষ্ট!

তৃতীয়—ভয়। একাকী বিদেশে যাইবার যে ভয়। দেশান্তর নির্ব্বাসন-দণ্ডে যে ভয় হয়—অজ্ঞাত অপরিচিত স্থান—কিরূপ লোকের মধ্যে বাস—কিরূপ কর্ম্মভার বহন করিতে হইবে, কিছুই জানা নাই। আমার মৃত্যুশয্যার চারিদিকে যে সকল চিরপরিচিত মুখ, তাদের কেহই সঙ্গে যাইবে না। তাদের ছাড়িয়া একাকী কোন্ অপরিচিত দেশে, কোন্ অপরিচিত লোকের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে—

ইহাতে কাহার মনে না ভয়ের সঞ্চার হয়?

এই সকল নানা কারণে আমরা মৃত্যু-ভয়ে ভীত হই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কি উপায়ে এই ভয় অতিক্রম করা যায়—মৃত্যুঞ্জয় কিসে হওয়া যায়?

নচিকেতা যখন যমের নিকট হইতে পরকাল সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন স্বয়ং যম তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

সেই অনাদ্যনন্ত মহতো মহীয়ান্ ধ্রুব সত্য সনাতনকে জানিয়াই মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হওয়া যায়।

আমি আপনাদিগকে আর অধিক কি বলিব? যুক্তি তর্ক দ্বারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত হয় না। আমি অনেক যুক্তি দেখাইয়া আপনাদিগকে বলিতে পারি যে আত্মা অবিনশ্বর—যখন জড়ের একটি পরমাণুও নষ্ট হয় না, তখন জ্ঞানময় প্রেমময় আত্মার বিনাশ অসম্ভব। এ দেহ ধূলিসাৎ হইবে, কিন্তু ইহার সঙ্গে আত্মার বিনাশ নাই।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

কিন্তু এ কথা আপনাদের মনে প্রবেশ করিবে না। পরলোক আছে কি না কে জানে? পরলোকে কি আছে কে দেখিয়া আসিয়াছে? আমি দেখাইতে পারি এই পরলোকে বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত সার্ব্বজনীন বিশ্বাস। কিন্তু ইহাতেও আপনাদের মনে প্রতীতি জন্মিবে না।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।

বিত্তমোহে মুগ্ধ প্রমাদী অবিবেকী মনুষ্যের নিকট পরকালতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না।

পরলোক আমাদের চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হয় না। বিশ্বাসের চক্ষু উন্মীলন কর—দৃশ্যমান জগৎ হইতে অদৃশ্য জগৎ—পৃথিবীর ঊর্দ্ধে প্রেমোজ্জ্বল স্বচ্ছ আকাশে আধ্যাত্মিক জগৎ দেখিতে পাইবে।

এখন সমস্যা এই—এই বিশ্বাস আসে কোথা হতে? ইহার উত্তর পরমাত্মার সহিত যোগবন্ধন হইতেই এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এখানেই এই যোগের যে সূত্রপাত হয়, ইহার শেষ এখানে নহে—ইহা নিত্যকালের যোগ; ইহা অমৃত যোগ—ইহার ভঙ্গ নাই, অন্ত নাই। ইহলোক হইতে লোকান্তরে গিয়া জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া আমার আত্মা পরমাত্মার সহিত গাঢ়তর মিলনে সম্মিলিত হইবে, এই বিশ্বাস ভগবান তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন, ইহার কখন অন্যথা হইবার নহে।

যে মানব ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রহিয়াছে সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—মৃত সঞ্জীবনী শক্তিকে দেখিতে পায় না। তাহার নিকট এই জগৎ শ্মশানতুল্য—এই রক্ত-মাংসের দেহই তাহার সর্ব্বস্ব। সে অন্তরের আত্মাকে দেখে না—পরলোক তাহার নিকট অন্ধকার। যখন সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করেন, তাঁহার প্রেম—তাঁহার মঙ্গলভাব হৃদয়ে যখন প্রতিভাত হয় তখন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূরে পলায়ন করে। সেই প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়। সেই প্রেমবলেই বিশ্বাস জাগিয়া উঠে। তখন আপনাপনি বুঝিতে পারি, সেই প্রেমময়ের সহিত আমার যে প্রেমবন্ধন, তাহা দুদিনের তরে নয়—তাহা অনন্তকালের বন্ধন। তখনই আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

যাঁহারা ইঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহারাই অমৃত লাভ করেন।

হে সাধু যুবা! ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাও, তোমার কোন ভয় নাই। যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই ত মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন, তবে কি ভয়? যিনি তোমার মঙ্গল উদ্দেশে তোমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমার কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনিই তোমাকে আপনার দিকে টানিয়া লইবেন। তাঁহার যা ইচ্ছা তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা---সে ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের করুণাময় অভয় মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে মৃত্যুতে তাঁহার কি ভয়? ঈশ্বরের আলোক অন্ধকারের দীপ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে মৃত্যুর রহস্য ভেদ করেন। সেই আলোকে তিনি মৃত্যুর পরপারে সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পান, যেখানে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতও নাই দুষ্কৃতও নাই—যাহা শুভ্র পুণ্যালোকে চির দীপ্তিমান্।

সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

—এই সেই সকৃদ্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা।

পিতা তুমি, প্রভু তুমি, আমি যে তোমার,
করজোড়ে প্রণিপাত করি বার বার।
তোমারে বুঝিতে চাই, এ ক্ষুদ্র জীবনে,
তোমারে হেরিতে চাই, এ দীন নয়নে।
তোমার মঙ্গল স্পর্শ পুলক মাঝার,
অভিষিক্ত হয়ে থাক পরাণে আমার।
আমার আমিত্ব সব দাও ভুলাইয়া,
তোমাতেই যুক্ত হোক, মুক্ত হোক হিয়া।
ভুলে যাই স্বার্থ পাপ, দৈন্য মাঝে আর,
যেন না বাঁধিয়া রাখি কল্পনা আমার।
আমার হৃদয় মাঝে প্রেম ভক্তি দিয়া,
তোমার পূজার স্থান রাখিব রচিয়া।
পুষ্পসম যেন প্রাণ তোমার পরশে,
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

আমার বলিতে যেন কিছু নাই আর,
কিরূপে এ বিশ্ববীণা করিছে ঝঙ্কার।
যা কিছু পড়িছে চোকে সব তোমাময়,
তোমার, মঙ্গলরূপে পূর্ণ সমুদয়।
যা কিছু অপূর্ণ ছিল আজ তাহা নাই,
সবি পরিপূর্ণ বিভু, কিছু নাহি চাই।
ভাবনা বেদনা কত অভাব মাঝার,
ব্যথিত হয়েছে এই হৃদয় আমার।
আজ যেন সব ত্যজি তোমারে লভিয়া,
অতুল আনন্দে পূর্ণ, এই ক্ষুদ্র হিয়া।
ব্যথা ভরা প্রাণে শুধু তোমার পরশ,
দিতেছে করিয়া হৃদি সজীব সরস।
যে বিশ্ব রাগিণী শুনি জগৎ মোহিত,
সে রাগিণী মোর প্রাণে হতেছে ধ্বনিত।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পুণ্যাহ।

এই দিন প্রজা জমীদারের মিলনের দিন। এই দিনে প্রজা নূতন বৎসরের প্রথম কিস্তির কর প্রদান করিয়া জমীদারের শাসন ও ন্যায্য অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, জমিদারও প্রজার প্রীতি ও কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। রাজা,প্রজার ধন-সম্পদ—স্বাস্থ্য-শান্তির বৃদ্ধি মানসে নত-জানু হইয়া মহেশ্বরের নিকটে হৃদয় খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রজাবর্গ স্ব স্ব দেয় কর হস্তে করিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তদ্দানে তাঁহার কোষ পূর্ণ করিতেছেন, এ দৃশ্য অতি মনোহর। উত্তর বঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুইটি জমীদারী আছে, একটি বিরাহিমপুর আর অপরটি পতিসর। গত ৩১ আষাঢ় এই দুই স্থানে পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিরাহিমপুরে স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার আচার্য্য ছিলেন পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ শিরোমণি। তিনি তথায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া তথাকার কর্ম্মচারী ও প্রজাদিগের প্রতি কল্যাণকর উপদেশ দিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অনেক ভদ্র ও বিশিষ্ট প্রজা সন্ধ্যায় কাছারী বাটীতে লুচি ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া আপ্যায়িত হয়েন।

পতিসরের কাছারীতে জমীদারের প্রতিনিধিরূপে তথাকার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চাকী পুণ্যাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তথায় আচার্য্য ছিলেন আমাদের প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়। এখানকার প্রজাবর্গ বড়ই নিরীহ ও রাজভক্ত। অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া হিন্দু মুসলমান প্রজা ও কাছারীর কর্ম্মচারীবৃন্দ উপবেশন করিলে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া হিন্দু প্রজাদিগের জন্য মনুর শাস্ত্র হইতে রাজবিধি ও মুসলমান প্রজাদিগের জন্য কোরাণের সুরাবিশেষ হইতে ধর্ম্মানুশাসন ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা সকলের হৃদ্য হইয়াছিল। এ দেশের প্রজাবর্গ সাধারণত দরিদ্র। বৎসরে পুণ্যাহের এই দিনে

প্রজাবর্গকে ফলাহারের নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহারা উৎসাহের সহিত এই নিমন্ত্রণে আগমন করে—এবং সমস্ত বৎসরটা এই দিনের উৎসব আনন্দ ভোগ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। ফলাহারের দ্রব্য চূড়া গুড় ও দধি মাত্র। কিন্তু ইহাতেই তাহাদের কত আনন্দ। এবৎসর প্রায় তিন হাজার প্রজা পংক্তি নিবদ্ধ হইয়া আহার করিয়াছিল। ইহারা নিজে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করে এবং সেই দধি গুড় মিশ্রিত একাংশ ভোজ্য, স্ত্রী পুত্রাদির জন্য বস্ত্রে বাঁধিয়া গৃহে লইয়া যায়। যাহারা ইহা ভোগ করে তাহারা এখানে আনন্দ লাভ করে এবং যাঁহারা দাতা তাঁহারাও পরলোকে 'উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি, ধর্ম্মাৎ ধর্ম্মং, সুখাৎ সুখং।' এইরূপ আদান প্রদানেই সংসারে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নানা কথা।

সমন্বয়।—পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার উত্তরে সাতটি গ্রামে প্রায় এক সহস্র হিন্দু বাস করেন; তাহারা (Labanas) লবণ বলিয়া খ্যাত। মোগল-রাজত্ব সময়ে কোন কারণে তাহারা হিন্দু-সমাজ হইতে রহিত হইয়া এতাধিক কাল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিগত মে মাসে হিন্দু-সমাজ তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে। আর্য্য-সমাজকে ইহার জন্য অগ্রসর হইতে হয় নাই। শুদ্ধ যে তাহারা হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তাহা নহে, পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। Indian World. June.

মতামত।—মিঃ আলফ্রেড নন্দীর সহিত :কনগ্রেসের বিশেষ যোগ আছে। তিনি নিজে খৃষ্টান। :তিনি আর্য্যসমাজের গুরুকুল সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য Hindustan Record এ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের উদারতা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন আস্তিক নাস্তিক অজ্ঞেয়-বাদী বহু-ঈশ্বরবাদী, হিন্দু-সমাজের ভিতরে এ সকলেরই স্থান আছে। পরস্পরের ভিতরে বিবাদ বিসম্বাদের লেশ মাত্র নাই। দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্য-সমাজের ভিতরে কোন কোন বিষয়ে তিনি অনুদারতার :উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্য-সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে (উদারশ্রেণীর) ব্রাহ্মেরা এক প্রকার হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন। হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব বা প্রভাব নাই। বিলাত প্রত্যাগত যুবকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মদল পুষ্ট করে। অন্য পক্ষে আর্য্য সমাজের লোকেরা জাতিভেদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের অনুরূপ কতকটা মত অন্তরে পোষণ করিলেও তাহারা প্রকাশ্যভাবে জাতিভেদ একেবারে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা পায় না, বা শঙ্কর-বিবাহে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা সমাজের ভিতরে থাকিয়া হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর প্রথা রহিত করিবার জন্য ভূরি চেষ্টা পাইতেছে। তাহার মূল্য এদেশের সমাজ-সংস্কার পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। The Same paper.

অশান্তি।—Rev. Lucas রেঃ লিউকস নামা জনৈক হৃদয়বান পাদ্রী ভারতের বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের ভিতরে রাজনৈতিক উচ্চ আশা ইহার মুখ্য কারণ নহে। সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমস্যা লইয়া লোকের ভিতরে আন্দোলন চলিতেছে। উহাই এই অশান্তির জনক। ভারত নব-কলেবরে জন্ম গ্রহণ করিবে, সেই সময় আসিয়া উপস্থিত। অন্যবিধ ঔষধ বা অস্ত্র চিকিৎসার পরিবর্ত্তে এক্ষণে সুনিপুণা ধাত্রীর প্রয়োজন। যাহাতে অণুমাত্র উত্তেজনা আসিতে পারে, এরূপ চিকিৎসা একেবারেই পরিত্যাজ্য। এই যে চাঞ্চল্যভাব, ইহা যে কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে? কিন্তু সমগ্র জগতে অল্পাধিক পরিমাণে এই অস্থিরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। হৃদয়বান মিসনরিগণ আমাদের দেশের ভিতরে থাকিয়া আভ্যন্তরিক ভাব যে ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, অপরের পক্ষে সত্যসত্যই তাহা দুর্ঘট। The Same paper.

আমাদের দুর্দ্দশা।—শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় "আমাদের সংসারে নিত্যকার অপচয়" প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমাদের-দেশে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১৮৭০ সালে প্রতি সহস্রে মৃত্যুসংখ্যা ২৮ জন ছিল, ১৮৮০ সাল ৩০ জন, ১৮৯০ সালে ৩২, ১৯০১ সালে ৩৫॥ জন। ৩৫॥ ভিতরে অর্দ্ধেক জ্বররোগে, সিকি কলেরা রোগে, অষ্টমাংশ উদরাময় প্রভৃতি রোগে, তাহার অর্দ্ধেকের বসন্তরোগে মৃত্যু ঘটিয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যত গুলি শিশু জন্মায়, তাহার প্রতি তিনটির ভিতরে শৈশবেই একটির মৃত্যু হয়। কিন্তু বিলাতের ন্যায় লোকবহুল স্থানে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা উহার অর্দ্ধেক। ভারতে এই রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষও বাড়িতেছে। খাদ্যের দাম দুই তিন গুণ হইয়াছে। খাদ্যাভাবে, জল-বায়ুর দোষে ও সামাজিক অনেকানেক কুপ্রথাবশত আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি। আমাদের খাদ্যের আয়তন বেশী, অথচ তাহাতে সারাংশ অতি অল্প। আমরা অতিরিক্ত তরল-পদার্থ ও লবণ খাই। তরল খাদ্যে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। অতিরিক্ত লবণ সেবনে শরীরকে অনর্থক ভারী ও থস্‌থসে করে, রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়, শরীর ও মনে জড়তা আনে। মধ্যাহ্নকালের গুরু আহারের পরেই কাজে দৌড়াইতে হয়। তাড়াতাড়ি খাইলে হজমের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিপ্রহরের সময়ে লঘু আহার করিয়া বৈকালে বা সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিলে সুফলের বিশেষ সম্ভাবনা। মৎস্য মাংস, ডিম্ব দুগ্ধ অল্প আঁচে সিদ্ধ করা ভাল। খুব বেশী ফুটিতে দেওয়া ভাল নহে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য চাউল ডাউল তরকারি অনেক ক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে সুসিদ্ধ ও আহারের উপযোগী হয়। অধিক মসলা সেবন হানিকর। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আহারের প্রণালী বদলাইবার জন্য মস্‌লার আবশ্যকতা আছে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময় আহার করা কর্ত্তব্য। আমরা চাউল সিদ্ধ করিয়া তাহার সারের অর্দ্ধাংশ কেন ফেলিয়া দেই।

চাউলের যে খুঁদ ফেলিয়া দিই, তাহাতে সারভাগ সমধিক। সংসারের স্ত্রীলোকগণের পর্য্যাপ্ত আহারের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। এই সকলের অভাবে আমরা এত শক্তি-হীন হইয়া পড়িতেছি।

A dying race। শ্রীযুক্ত ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় কৃত উক্ত নামের একখানি পুস্তক উপহার স্বরূপ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি জনসংখ্যা বিবরণ ধরিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সংখ্যার হিসাবে হিন্দু-জাতির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। ১৮৭২ সালের সেন্‌সস্ রিপোর্টে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১৭১ লক্ষ এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৬৭ লক্ষ ছিল। ১৮৮১ সালের গণনাতে হিন্দুর সংখ্যা ১৭২ লক্ষ এবং মুসলমান সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৭৯ লক্ষে দাঁড়ায়। ১৮৯১ সালের গণনাতে হিন্দুসংখ্যা ১৮০ লক্ষ এবং মুসলমান সংখ্যা ১৯৬ লক্ষ এবং ১৯০১ সালের গণনাতে হিন্দু ১৯৪ লক্ষ এবং মুসলমান ২২০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। অন্তকথায় এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান, যাহারা হিন্দু অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম ছিল, তাহারা হিন্দু অপেক্ষা ২৫ লক্ষ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ মুসলমান শতকরা ৩৩ জন বাড়িয়াছে এবং হিন্দু শতকরা ১৭ জন বাড়িয়াছে। এইবারে জন্মসংখ্যা গণনাতে মুসলমান যে আরও বাড়িবে তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশে একই জলবায়ুর মধ্যে রহিয়াছে, অথচ উভয়ের এতাদৃশ্য তারতম্য বিস্ময়কর বলিতে হইবে। ১৮৯১ সালে ওডোনেল (C. J.O. Donnell) সাহেব সেন্‌সস্ কমিসনর ছিলেন। তিনি বলেন এইরূপ ভাবে চলিলে বঙ্গ-দেশ হইতে সুদূর ভবিষ্যতে হিন্দু-জাতির বিলোপের আশঙ্কা আছে। এই সংখ্যা-ক্ষয়ের কারণ বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি।

ভয়েসী সাহেব।—বিগত ১৯০৯ সালের ২০এ জুন তারিখে রেভারেণ্ড ভয়েসী সাহেব (Not peace but sword) "শান্তি নহে, কিন্তু সংগ্রাম" এই নামে বিলাতের Theistic church এ একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। ভয়েসী সাহেব আমাদের বিশেষ পরিচিত। তিনি যিশুখৃষ্টের দেবত্ব ও মধ্যবর্ত্তিতার বিরোধী। এইখানে তাঁহার সঙ্গে আমাদের এক মত। বাস্তবিক যিশুখৃষ্ট যে একজন মহা সাধু-পুরুষ ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমগ্র সভ্য-সমাজের ও জাতির ধর্ম্ম, ইহাও এক প্রকার সুনিশ্চিত। কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বরের আসন কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিতে আমরা সঙ্কুচিত। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নীতিমার্গ অবলম্বনে মনুষ্যত্ব-লাভের যে সম্ভাবনা, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া বিচার দিনে তাঁহার নামে ও তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় মনুষ্যের মুক্তি ও সদ্গতি, এ কথা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। ভয়েসী সাহেব মথিলিখিত সুসমাচারের দশম অধ্যায়ের ৩২ হইতে ৩৭ পদ অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। বাইবেলের অনুবাদ এইরূপ, খৃষ্ট বলিতেছেন "যে কোন ব্যক্তি আমাকে লোকমাঝে স্বীকার করিবে, আমিও তাহাকে আমার সেই স্বর্গস্থ পিতার নিকট স্বীকার করিব। কিন্তু লোকের নিকটে যে কেহ আমাকে অস্বীকার করে, আমিও তাহাকে আমার সেই পিতার নিকট অস্বীকার করিব। তোমরা মনে করিও না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি (বিস্তার) স্থাপন করিতে আসিয়াছি, শান্তি নহে, তোমাদের মধ্যে খড়্গ স্থাপন করিতে আসিয়াছি। কারণ আমি পিতা পুত্রে মাতা কন্যায় শ্বশ্রূ বধুতে বিচ্ছেদ বাঁধাইতে আসিয়াছি। মনুষ্যের পরিজনই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। যে কেহ পিতা কিম্বা মাতাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে সে আমার যোগ্য নহে। আর যে পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নহে।" ভয়েসী সাহেব বলেন এবং আমরাও স্বীকার করি যে যখন কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়, তখন নব-দীক্ষিতের সঙ্গে তাহার পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয়-স্বজনের বিবাদ অনিবার্য্য। কিন্তু ভয়েসী সাহেব বলেন "আমি পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ স্থাপন করিতে আসিয়াছি" খৃষ্টের এ কথাটি বিশেষ আপত্তিকর। তাঁহার মতে খৃষ্টের এ কথার অন্যতর উদার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। আমরা ভয়েসী সাহেবের অন্যান্য যুক্তি আলোচনা না করিয়া এইমাত্র বলিতে চাই, ভয়েসী সাহেব যেরূপ অক্ষরশঃ অনুবাদ গ্রহণ করিয়া খৃষ্টকে দোষ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। Expressionএ অর্থাৎ ভাব-প্রকাশে সামান্য ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যিশু এই কারণে নিন্দাবাদের যোগ্য হইতে পারেন না। তাঁহার কথার অভিপ্রায় কি ছিল, তাহাই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

আবিষ্কার।—ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ (Foocher) ফুচার সাহেব পেশোয়ারের সন্নিকট সম্রাট কনিষ্ক নির্ম্মিত পেগোডা অর্থাৎ বৌদ্ধ-মন্দির বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি Dr. Spooner স্পুনার সাহেব ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহার ব্যাসার্দ্ধ ২৮৫ ফুট এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিলেও বলা যাইতে পারে। চীন পরিব্রাজক হিয়ানসাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উহার উল্লেখ আছে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটি পিত্তলাধার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার ভিতরে তিনখণ্ড দগ্ধ অস্থি আছে। সম্ভবতঃ উহা গৌতমবুদ্ধের। স্তম্ভের ভিতরে আরও নিম্নে একটি অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মাকৃতির উপরে তিনটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, একজন উপবিষ্ট, উহার উভয় পার্শ্বে দুইজন বৌদ্ধ দণ্ডায়মান। নিকটে রাজার মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ ইহা রাজা কণিষ্কের। ঐ যে সুন্দর স্তম্ভ, অনুমিত হয়, উহা প্রাচীন Agisalaos এগিসালোসের শিল্পনৈপুণ্যে গঠিত। আধারটিতে অত্যুচ্চ গান্ধার-শিল্পের সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। যাহা কিছু মিলিয়াছে, তাহার অধিকাংশ পেশোয়ারের মিউজিয়মে রক্ষিত হইবে। অমৃতবাজার ২৬এ জুলাই।

বিলাতে ভারতীয়-ছাত্র।—বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৭৩০ জন। ইহার প্রায় ৪০০ জন আইন, ১২০ জন চিকিৎসা, ১০০ জন সাহিত্য গণিত, ৯০ জন শিল্প ও ২০ জন পুস্ত-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৪ সংখ্যা | ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

ছুটির পর।

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে)

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হইলাম। কর্ম্ম হইতে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য নয়—কর্ম্মের সহিত যোগকে নবীন রাখিবার ইহাই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যদি এই রূপ দূরে না যাই তবে কর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিনা। অবিশ্রাম কর্ম্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে কর্ম্মটাকেই অতিশয় একান্ত করিয়া দেখা হয়। কর্ম্ম তখন মাকড়ষার জালের মত আমাদিগকে চারিদিক হইতে এমনি আচ্ছন্ন করিয়া ধরে যে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিবার সামর্থ্যই আমাদের থাকেনা। এই জন্য অভ্যস্ত কর্ম্মকে পুনরায় নূতন করিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করিব বলিয়াই এক একবার কর্ম্ম হইতে আমরা সরিয়া যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য নহে।

আমরা কেবলই কর্ম্মকেই দেখিবনা। কর্ত্তাকেও দেখিতে হইবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার কারখানার মুটেমজুরের মতই সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুল মাখিয়া দিন কাটাইয়া দিবনা; একবার দিনান্তে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কারখানার মনিবকে যদি দেখিয়া আসিতে পারি তবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করিয়া কলের একাধিপত্যের হাত এড়াইতে পরি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলি কলের চাকা চালাইতে চালাইতে আমরাও কলেরই সামিল হইয়া উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্ম্মকে দেখিতেছিনা? এই কর্ম্মের মর্ম্মগত সত্যটী অভ্যাস বশত আমাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিল তাহাকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দেখিয়া কি আনন্দ বোধ হইতেছেনা?

এ আনন্দ কিসের জন্য? এ কি সফলতার মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া? এ কি এই মনে করিয়া যে, আমরা যাহা করিতে

চাহিয়াছিলাম তাহা করিয়া তুলিয়াছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্ত্তির গর্ব্বানুভবের আনন্দ?

তাহা নহে। কর্ম্মকেই চরম মনে করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে মানুষ কর্ম্মকে লইয়া আত্মশক্তির গর্ব্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্ম্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্ম্মের চেয়ে বহুগুণে বড় জিনিষটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহঙ্কার দূর হইয়া যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া পড়ে তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হইয়া ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখিতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকেই দেখিনা।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র? কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খাটিয়া মরা এবং খাটাইয়া মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করিয়া মনে করা খুব একটা ফল পাইলাম? তাহা নহে।

এই চেষ্টাকে বড় করিয়া দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড় ফল বলিয়া গর্ব্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলিয়া দেখি তবে মঙ্গল কর্ম্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখিতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাহাই। মঙ্গল কর্ম্ম সেই বিশ্বকর্ম্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখিবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না—নিরুদ্যম যে, তাহার চিত্তে তাঁহার প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম্ম-নহিলে কর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্মের গৌরব থাকিতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্ম্মাকেই লাভ করিবার একটি সাধনা তাহা হইলে কর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তাহা আমাদিগকে হতাশ করিতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকিলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখিলে কর্ম্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠি না—কারণ, কর্ম্মফলের চেয়ে আরো যে বড় ফল আছে। প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইব বলিয়া কোমর বাঁধিলে চলিবে না—বস্তুত কৃতকার্য্য হইব কি না তাহা জানি না—কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়—তাহাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হইয়া ক্রমশ দীপ্যমান হইয়া উঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁহার প্রকাশ উন্মুক্ত হইতে থাকে। আনন্দিত হও, যে, কর্ম্মে বাধা আছে—আনন্দিত হও, যে, কর্ম্ম করিতে গেলেই তোমাকে নানাদিক হইতে নানা আঘাত সহিতে হইবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করিতেছ বারম্বার তাহার পরাভব ঘটিবে, আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝিবে ও অপমানিত করিবে—আনন্দিত হও, যে, তুমি যে বেতনটি পাইবে বলিয়া লোভ করিয়া বসিয়াছিলে বারম্বার তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। কারণ, ইহাই যে সাধনা। যে ব্যক্তি আগুন জ্বালিতে চায়, সে ব্যক্তির কাঠ পুড়িতেছে বলিয়া দুঃখ করিলে চলিবে কেন? যে কৃপণ শুধু

শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করিয়া তুলিতে চায় তাহার কথা ছাড়িয়া দাও! তাই ছুটির পরে কর্ম্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সহিত প্রবেশ করিতেছি। কাহাকে দেখিয়া? যিনি কর্ম্মের উপরে বসিয়া আছেন তাঁহার দিকেই চাহিয়া।

তাঁহার দিকে চাহিলে কর্ম্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলিয়া যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখিতে পাই না, তাহার শান্তিমূর্ত্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলিতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে—ভরা জোয়ারের জলের মত সমস্ত থম্‌থম্‌ করিতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা কোমর বাঁধিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া দাপাদাপি করা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচিয়া যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে—যেমন সুন্দর আজিকার এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী! তাহার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তাহার ভয়ঙ্কর উদ্যম কি পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করিয়া কি কমনীয় হাসিই হাসিতেছে! আমরাও আমাদের কর্ম্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দর রূপ দেখিয়া উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করিব—কর্ম্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া দিব—আমাদের কর্ম্ম, মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্‌, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় হইয়া উঠিবে।

শ্বশুরের মঙ্গল কামনায় নব বিবাহিতা বালিকার

প্রার্থনা। *

আমার জীবনে এমন একটী দিন আসিয়াছিল, যে দিন হইতে আমার জীবনকে উন্নত করিবার জন্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এই সকল নারীগুণে বিভূষিত করিবার জন্য পরমেশ্বর আমাকে তোমাদের স্নেহের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। যে সম্বন্ধ সমগ্র মানবমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আজ আমি তোমাদিগকে পিতা মাতারূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ। এই অভাবনীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমি দয়াময় ঈশ্বরকে প্রণাম করি। হে পরমপিতা! তুমি কৃপা করিয়া আমার নূতন চক্ষু উন্মোচন করিয়া দিয়াছ। এতদিন তোমায় এ ভাবে পাই নাই। তোমার নব প্রেম-আলিঙ্গনে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। তুমি আমায় সাধুসঙ্গ দিয়া ও তোমার প্রতিনিধি যে পরম পূজনীয় পিতা মাতা তাঁহাদের দ্বারা আমাকে তোমার সেই সুপ্রশস্ত কণ্টকবিহীন পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমার প্রেমের অন্ত নাই। তুমি প্রেমময়। তোমার প্রেমে আমাকে যে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছ। সহস্রধারে তোমার প্রেম

---

* এই বালিকা বধূর হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত কথাগুলি কেমন সরল সুন্দর মহান ভাবপূর্ণ। ধনী দরিদ্র সকল হিন্দুর ঘরেই বালিকা বধূ আছে। প্রাণাধিক পুত্রের বালিকা-বধূ মায়ের প্রাণের কত শত সাধ-বাসনাজড়িত বাঞ্ছার ধন, কত আদরের জিনিস—এই বালিকা-বধূর ন্যায় মহানভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া—"সমগ্র মানবমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া" শ্বশুর শাশুড়ীকে "পিতা মাতা রূপে লাভ" করিয়াছেন, আর সেই "পরম পূজনীয় পিতামাতা" ঈশ্বরের "প্রতিনিধি" এবং বধূর "জীবনকে উন্নত করিবার জন্য পরমেশ্বর" তাহাকে শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন—যদি সকল বালিকা-বধূই তাহাদের শ্বশুরালয়ের নূতন জীবন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সে শ্বশুরালয় কি মধুর পবিত্র প্রীতিময় হয়!!

সম্পাদক।

আমার প্রতি অবিরাম অবিশ্রান্ত ঢালিতেছে। কিন্তু আমি কি হৃদয়হীন! আমি এত কৃতঘ্ন যে প্রতিদিন একবিন্দুও প্রেম তোমার চরণে উপহার দিতে সমর্থ হই না। কত মোহে মগ্ন থাকি, সত্য হইতে কত দূরে, কতদূরে বিচরণ করি; তোমার সুধাসিঞ্চিত প্রেম-আলিঙ্গন ভুলিয়া যাই। তবুও তোমার চন্দ্র আমায় স্নিগ্ধ আলো দেয়, সূর্য্য আমায় দীপ্তিমান জ্যোতি দান করে ও তোমার অনন্ত বৈচিত্রময় ধরাতল কত শান্তি দেয় এবং তোমার অসীম সৌন্দর্য্যপূর্ণ নভঃস্থল মাতার ন্যায় দেহ আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখে. ইহার ত কণামাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে না। যাঁহার স্নেহের আশ্রয়ে থাকিয়া অদ্য তোমায় এই সকল কথা বলিতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাঁহার গৃহে আসিয়া তোমায় আমার অন্তরের অন্তরে পাইয়াছি, সেই পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পিতৃদেবের জন্মদিনোপলক্ষে তোমার কাছে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে উপস্থিত। তাঁহার স্নেহের ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। তবুও আজি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রার্থনার সুললিত সঙ্গীত ভরিয়া, অসীম সাহসে শির উন্নত করিয়া তোমার নিকটে যাচিতেছি যে আমার এই প্রার্থনা তোমার চরণে গ্রহণ করিতেই হইবে। হে বিশ্বনাথ! তুমি আমার পরম স্নেহময় পিতাকে সুস্থ ও সবল রাখ এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান কর ও তোমার করুণা তাঁহার প্রতি বর্ষণ কর। এই তোমার কাছে প্রার্থনা; এই আমার চিরন্তন প্রার্থনা।

পাতিব্রত্য।

স্বামী স্ত্রীলোকের মহদ্‌গুরু এইটি সকল স্ত্রীলোকের জানা আছে। তিনি আমাদের দেবতুল্য। স্বামী আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। তাঁহাকে আমাদের সতত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রীলোক স্বামীগত প্রাণ হইলে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়। সচ্চরিত্র গুণবান স্বামী পাইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা কত তপস্যা কত আরাধনা করেন, কত পূজার্চ্চনা করেন। সকল-সুখ-কল্যাণকর পরমপিতা পরমেশ্বর, যিনি তাঁহার পুত্র কন্যা সন্তানদিগের জন্য সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করিতেছেন, ভাল স্বামী লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। বিবাহের পর যাহাতে স্বামীর সংসারে আসিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হয়েন এবং স্বামীকে সর্ব্ববিষয়ে প্রসন্ন করিতে সক্ষম হয়েন, সেই বিষয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের বিশেষ যত্নবতী হওয়া চাই। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য ব্রতে ব্রতী হইয়া পতিপরায়ণা হওয়া উচিত। পতি পত্নীর উভয়ের মনের মিল হওয়া চাই, অভিন্ন হৃদয়ে পরস্পরে যুক্ত হইতে হইবে। পতিসেবা স্ত্রীলোকের একটি পরম ধর্ম্ম। পতিকে গুরু মানিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কিছুতেই তেমন সুখ হয় না। যাহাতে স্বামীর কোন বিষয়ে বিরক্তি এবং কষ্টের কারণ উপস্থিত না হয় সেইদিকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য থাকা চাই। যাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলাম, পিতামাতাকে ছাড়িয়া চিরজীবনের মত যে স্বামীর গৃহে আসিলাম, সেই স্বামীর গৃহ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, শ্বশুরকুলের যাহাতে গৌরব বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মে কর্ম্মে সমন্বিতা

হইয়া পবিত্রভাবে সংসারের সকল কর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে চালাইলে সেই গৃহ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। ধর্ম্মকর্ম্ম নিজগৃহে থাকিয়া পরিবারের মধ্যে যেরূপে করিতে পারা যায়, তেমন আর কোথাও হয় না। নিজ পিতামাতাকে ছাড়িয়া আসিয়া স্বামীর পিতামাতা, স্বামীর ভাইভগিনী, স্বামীর আ-ত্মীয় স্বজন—এ সকলকে আপন বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। আপন পিতামাতা ভাইভগিনীর মত ইঁহাদের যত্ন, সেবা শুশ্রূষা করিয়া স্বামীর প্রিয় হইতে হইবে। স্ত্রী-লোকের পক্ষে এই ত্যাগস্বীকার আন্তরিক প্রফুল্লতার সহিত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই ত্যাগস্বীকারে কত সুখ পাওয়া যায়। ভগবানের দৃষ্টিতে ইহা অতি প্রিয় বলিয়া ইহা মনুষ্যেরও প্রিয় জানিবে। ইহাতেই পারিবারিক সুখসম্পদ বর্দ্ধিত হয় এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলা দূর হয়। স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গরূপে আমরা ব্যক্ত। তাঁর সুখে তাঁর সম্পদে আমাদের সুখ সম্পদ, তাঁহার দুঃখ কষ্টে আমাদের দুঃখ কষ্ট মনে করিতে হইবে। স্বামীর অবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া পত্নীকে চলিতে হইবে। নিজের পিতা মাতা ধনী হইলে স্বামীর দুঃখদারিদ্র্যে কাতর হইয়া স্বামীর উপর অশ্রদ্ধা করি-বেক না। স্বামীর অবস্থানুযায়ী সকল কর্ম্মে সহায়তাদ্বারা প্রফুল্লমনে সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং সহ-ভোগিনী হইতে হইবে। নিজে দরিদ্রের কন্যা হইয়া ধনী স্বামীর ঘরে আসিলে তাঁহার সুখ সম্পদে বিহ্বল হইয়া আলস্যে দিন কাটাইবেক না। স্বামী সচ্চরিত্র, ধা-র্ম্মিক ও বিদ্বান হইলে স্ত্রীর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। কিন্তু স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হন তাহা হইলে যদি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া কঠোর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সতত কলহে প্রবৃত্ত হও এবং উগ্রতা প্রদর্শন কর তাহা হইলে কখনো সুফল প্রাপ্ত হইবে না। সুশীলা সচ্চরিত্রা পতিপ্রাণা স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর দোষ অগ্রাহ্য করিয়া মধুর আলাপে মধুর বাক্যে, সেবা শুশ্রূষার দ্বারা, সতত সদাচরণ এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বামীকে সুখী করিবার উপায় অবলম্বন করা। স্বামীর দোষ শুনিলেও পাপ হয়। তাহার মহৎ দৃষ্টান্ত—যখন দক্ষ যজ্ঞ হয়, তখন দুর্গার সমক্ষে তাঁহার পিতা শিবের অনেক নিন্দা করাতে তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পিতা কন্যার নিকট স্বামীকে অনুপযুক্ত বলিয়া যুক্তি দেখাইতে গিয়া শেষে নিজের কন্যা-টিকেই হারাইলেন। আদর্শ-সতীস্ত্রীর স্বামীর উপর কিরূপ ভক্তি প্রকাশ পাইয়া-ছিল! সতী পিতার নিকটেও স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পতিব্রতা সতী স্ত্রীর আরও কত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সীতা নিজের সতীত্ব প্রমাণ করাইবার জন্য অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বামীর প্রিয় হইয়া সকলের সম্ভ্রমনীয় হইয়াছিলেন। সাবিত্রী স্বামীর মৃতদেহ লইয়া সজীব করাইবার জন্য যম দেবতার পর্য্যন্ত শরণাগত হইয়া-ছিলেন এবং তাঁহার সতীত্বে প্রসন্ন হইয়া যমদেব বর প্রদান পূর্ব্বক স্বামীর জীবনদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল স্ত্রীলোক আমাদের পূজনীয়া ও প্রাতঃ-স্মরণীয়া। এদেশে সতী নারীর জ্বলন্ত দৃষ্টা-ন্তের অভাব নাই। এই সকল স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত। পিতামাতার কর্ত্তব্য যে তাঁহারা বাল্যকালে ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষা এবং সদু-

পদেশ দ্বারা কন্যাদিগের মনকে এরূপভাবে গঠিত করেন যে তাঁহারা স্বামীর গৃহে আসিয়া শ্রীতে ও হ্রীতে পরিপুষ্ট হইতে পারে। পরমেশ্বর শুভ অভিপ্রায়ে তাঁহার শুভ সংকল্প সাধিত করিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের পরস্পরকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার নিয়ম করিয়া দিয়া ও দাম্পত্য ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে একটি গুরুতর সম্বন্ধে সংযোজিত করিয়াছেন। এই ঐশ্বরিক নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পতি পত্নী উভয়ে মিলিতভাবে পরস্পরের প্রতি অব্যভিচারী থাকিলে সংসারে প্রভূত মঙ্গল হয়। আমাদিগকে স্বামীর অনুগতা ও আজ্ঞানুসারিণী হইয়া চলিতে হইবে। স্বামীর সঙ্গে সকল কর্ম্মে যোগ দিয়া, তাঁহাকে নেতা ভাবিয়া, সকল কর্ম্মে সহায়তাদ্বারা, সৎপরামর্শ দ্বারা সুশীলা স্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্য করিতে যত্নবান হইতে হইবে এবং সতত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। পতিব্রতা সতীর প্রেম কি বিশুদ্ধ! পতি পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমে সকলই পবিত্র হয়। ইহার বিপরীতে পতি পত্নীর কেহ ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, সংসার হইতে সুখ শান্তি দূরে পলায়ন করে এবং গৃহ অশান্তির আলয় হয়। পিতামাতা ভাল না হইলে সন্তানকে কাহার দৃষ্টান্তে ভাল করিবে? সেইজন্য পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে নিজেদের মনকে উন্নত কর, তবে তোমার গৃহ পরিবার সকলি উজ্জ্বল হইয়া শোভাময় হইবে। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর কোন মতের অনুমোদন করিতে না পারিলে বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহার মনে কষ্ট উৎপাদন করিবেক না; সর্ব্বদা সুশীলা, সচ্চরিত্রা ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সৎকার্য্যে সুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহার সহায় হইতে হইবে। পতি ও পত্নী উভয়েরই সুশীল, সচ্চরিত্র এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা না হইলে একের দোষে অন্যকে কষ্ট পাইতে হয় এবং পরিবারের মধ্যে অশেষ অশান্তি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়। পতিপত্নী উভয়ে আপনাদিগকে পরমপিতা পরমেশ্বরের দাস দাসী ভাবিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত থাকিলে দম্পতির বিশুদ্ধ প্রেমে সকল সুখ বর্দ্ধিত হইবে। ইহাই সকলের কল্যাণকর। সতী সাধ্বী স্ত্রীর পতির প্রিয় হইতে কত না ইচ্ছা যায়। স্বামীর কল্যাণের জন্য, এবং সকল কল্যাণের জন্য পরমপিতা পরমেশ্বরের শরণাগত হইতে হয়। তিনি ভিন্ন আমাদের কিছুতেই গতি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, "যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চয় কল্যাণ। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন। এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।" নিজের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকল কর্ম্ম করিলে সুখ শান্তিতে সকলি পবিত্র হইবে। সকল সুখের মূলে পরমপিতা পরমেশ্বর। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত দাম্পত্যপ্রেমই বল, কি পারিবারিক সুখশান্তিই বল, কিছুই স্থিতিশীল হয় না। অতএব সকল কর্ম্ম সম্পাদনের আগে তাঁকে প্রণিপাত করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করিয়া পতিপত্নী পরস্পরের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান হইবেক।

বায়ুর অঙ্গারকবাষ্প।

কাঠ কয়লা প্রভৃতি দাহ্যপদার্থে প্রচুর অঙ্গার মিশ্রিত আছে। আমরা এই সকল জিনিসকে যখন জ্বালাইতে আরম্ভ করি, তখন ঐ সকল অঙ্গার (Carbon) বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid gas) উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং রাসায়নিক কার্য্যের জন্য প্রচুর তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাঠ ও কয়লার আগুন জ্বালাইলে যেমন তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কতকটা অঙ্গারক বাষ্পও উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়।

পৃথিবীর সমগ্র কল-কারখানায় বৎসরে কত কয়লা পোড়ে, তাহা স্থির করা কঠিন নয়। সুতরাং উহা হইতে কত অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত হয় তাহারও হিসাব চলে। এইপ্রকার গণনায় দেখা গিয়াছে, কেবল কয়লার দাহনে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৬ টন্ অর্থাৎ প্রায় একুশ শত মণ ওজনের অঙ্গারকবাষ্প আমাদের আকাশের বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে। বলা বাহুল্য কেবল অগ্নিই বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্প জোগায় না। প্রাণীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত ঐ বাষ্পের এক একটু বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে, এবং নানা জৈব পদার্থের পচনেও অঙ্গারকবাষ্প উৎপন্ন হইতেছে; ইহারও একটি মোটামুটি হিসাব খাড়া করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাব হইতে দেখা যায়, দশ লক্ষ লোক প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আড়াই টন্ অর্থাৎ সত্তর মণ ওজনের অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।

অঙ্গারকবাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিশাল বাষ্পের স্তূপ প্রতি মুহূর্ত্তে বায়ুতে আসিয়া পড়িতে থাকিলে, তাহা ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম প্রদেশে সঞ্চিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তাহা দেখা যায় না। যে সকল তরল বা বায়বীয় পদার্থের ঘনতা একপ্রকার নয়, একত্র রাখিলেই তাহারা ধীরে ধীরে পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক সমঘন মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন করিতে থাকে। এটি তরল এবং বায়বীয় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে আসিয়া পড়িলেই, পূর্ব্বোক্ত কারণে বায়ুর সহিত বেশ সমানভাবে মিশিয়া যায়।

সমগ্র বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ অঙ্গারকবাষ্প আছে তাহা নানা প্রকারে স্থির করা হইয়াছে। এই সকল হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের কারখানা এবং কলের অগ্নি হইতে প্রতি বৎসর যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার হাজার গুণ অঙ্গারকবাষ্প সর্ব্বদাই আকাশের বায়ুতে মিশ্রিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে হাজার বৎসর ধরিয়া কল কারখানার কাজ চলিতে থাকিলে কেবল কলের অগ্নি দ্বারাই বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্পের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে।

অঙ্গারকবাষ্প উদ্ভিদের একটি প্রধান ভোজ্য, কিন্তু প্রাণীসকল সাক্ষাৎভাবে ইহা হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। বরং শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত এই বাষ্পটিকে দেহস্থ করিলে, তাহা বিষবৎ কার্য্য করে। দশ হাজার ভাগ বায়ুতে ১৫ভাগ অঙ্গারকবাষ্প থাকিলেই, তাহা প্রাণীর জীবনরক্ষার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তখন তাহার দ্বারা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে না। পৃথিবীর নানা অংশে কল-কারখানার সংখ্যা যে প্রকার দ্রুত বাড়িয়া চলি-

য়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে বায়ু দূষিত হইতে হইতে শীঘ্রই ঐ সীমায় আসিয়া পৌঁছিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে ঠিক্ ঐ আশঙ্কারই উদয় হইয়াছিল। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসর পূর্ব্বে আকাশের বায়ু পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে যে পরিমাণ অঙ্গারকবাষ্পের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন কালের সেই পরীক্ষার ফলের সহিত আধুনিক পরীক্ষার ফলের কি প্রকার পার্থক্য হয় জানিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আশা করিয়াছিলেন, এখনকার বায়ুমণ্ডলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প ধরা পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আধুনিক জনাকীর্ণ প্রদেশের বায়ুমণ্ডলেও অঙ্গারকবাষ্পের একটু আধিক্য দেখা যায় নাই। শত বৎসর পূর্ব্বেকার কল-কারখানা-হীন সময়ে আকাশে যে পরিমাণ অঙ্গারকবাষ্প থাকিত, এখনকার বায়ুতে প্রায় তাহাই দেখা গিয়াছিল।

অধিকাংশ উদ্ভিদই অঙ্গারকবাষ্পকে নষ্ট করে। উদ্ভিদ্—দেহে যে হরিদ্-বর্ণের পদার্থ (Chlorophyll) মিশ্রিত থাকে, তাহাই বায়ুর অঙ্গারকবাষ্পকে টানিয়া লইয়া সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গার এবং অক্সিজেনে পরিণত করিয়া ফেলে। পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদ্ গড়ে কি পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প নষ্ট করে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করা কঠিন নয়। এইপ্রকার গণনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর সমবেত জনমণ্ডলী এবং অপর প্রাণিগণ যে অঙ্গারকবাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়, পৃথিবীর সমবেত উদ্ভিদ্ তাহার অধিক বাষ্প কখনই নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে কল-কারখানার কয়লার দাহন হইতে যে বিশাল বাষ্পস্তূপ নিয়তই বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে, জমা-খরচে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

অঙ্গারকবাষ্পের আধিক্যে বায়ু দূষিত হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রহস্যময় ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধরিয়া বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়কর। ইহাঁরা বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়িয়া যে সকল সাগর মহাসাগর রহিয়াছে, তাহারা যেমন মেঘোৎপত্তি করিয়া এবং বায়ুপ্রবাহকে নিয়মিত রাখিয়া স্থলভাগকে সরস উর্ব্বর করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল হইতে অস্বাস্থ্যকর অঙ্গারকবাষ্প শোষণ করিয়াও পৃথিবীকে জীববাসোপযোগী করিয়া রাখিতেছে। জল জিনিসটা তরল পদার্থ হইলেও, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ তাহাতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশিয়া থাকিতে পারে। বরফ-গলা এক ঘন ফুট (Cubic foot) জলে ঠিক্ সেই আয়তনের ১১৫০ গুণ আমোনিয়া-বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। বায়ুও জলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত বায়ুই অধিকাংশ জলচর প্রাণীদিগকে জীবিত রাখে। জলের এই বিশেষ ধর্ম্মটির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বায়ুরাশিতে নানা প্রকারে যে অঙ্গারকবাষ্প আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অনেকটা সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া রাখে।

একটা উদাহরণ লইলে এই শোষণ ব্যাপারটির কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে করা যাউক যেন কুড়ি হাজার ঘন ফুট আয়তনের একটি বাক্সে দশ হাজার ঘন ফুট সাধারণ বায়ু ও ঠিক সেই পরিমাণ জল আছে, এবং বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আকাশের বায়ুর দশ হাজার ভাগে সাধারণতঃ তিন ভাগ অঙ্গারকবাষ্প থাকে। সুতরাং বাক্সে আবদ্ধ দশ হাজার ঘন ফুট বায়ুতে নিশ্চয়ই তিন ঘন ফুট অঙ্গারকবাষ্প মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা জলের একটি প্রধান ধর্ম্ম। কাজেই এখানে আবদ্ধ জল অঙ্গারকবাষ্পমিশ্রিত বায়ুকে শোষণ করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটু করিয়া বায়ু জল ছাড়িয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। এই দুই বিপরীত কার্য্য বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে শেষে এমন একটি সময় আসিবে যখন জলের বায়ু-উদ্গীরণ এবং বায়ু-শোষণের মাত্রা ঠিক একই হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় উপরের বায়ু এবং জলমিশ্রিত বায়ু এই উভয়ের চাপ সমান হইয়া পড়ে। কাজেই তখন জল আর নূতন করিয়া বায়ু শোষণ করিতে পারে না।

এখন বায়ুর সহিত মিশ্রিত অঙ্গারক বাষ্পের অবস্থা কি হইল আলোচনা করা যাউক। বায়ুতে তিন ঘন-ফিট্ অঙ্গারকবাষ্প মিশ্রিত ছিল। কাজেই যখন আবদ্ধ জল সেই দশ হাজার ঘন-ফিট্ বায়ুর অর্দ্ধেক শোষণ করিয়া ভিতর ও বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় আনিয়াছিল, তখন অঙ্গারকবাষ্পেরও অর্দ্ধেক শোষণ করা ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না। অঙ্গারকবাষ্পই বায়ুকে দূষিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে দূষিত বায়ু কিয়ৎকাল জলের সংস্পর্শে থাকিলেই জল অস্বাস্থ্যকর বাষ্পকে হরণ করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল করিয়া তোলে। উদাহৃত বায়ুতে তিন ঘনফিট্ অঙ্গারকবাষ্প না থাকিয়া যদি ছয় ঘনফিট থাকিত, তাহা হইলেও উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন ঘনফিট বাষ্প জল অনায়াসে শোষণ করিয়া রাখিতে পারিত।

আমরা পূর্ব্বের উদাহরণে জল এবং বায়ুর আয়তন সমান ধরিয়া হিসাব করিয়াছি। বলা বাহুল্য জলের আয়তন যদি বায়ুর আয়তন অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়ায় তখন জল আয়তনের অনুপাতে অধিক করিয়া অঙ্গারকবাষ্প শোষণ করিতে থাকিবে। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া যে সাগর মহাসাগর গুলি বিশাল জলরাশি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তাহারাই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ু-রাশিতে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অঙ্গারকবাষ্প থাকিতে দিতেছে না। আধুনিক কল-কারখানা হইতে যে প্রচুর অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে, সমুদ্রের জলরাশিই তাহার অধিকাংশ ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল রাখিতেছে; এবং আবার কোন কারণে যখন বায়ুর অঙ্গারকবাষ্পের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ভিতর বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় রাখিবার জন্য সেই সকল জলরাশিই পূর্ব্বশোষিত অঙ্গারকবাষ্প উদ্গীরণ করিয়া আকাশের অঙ্গারকবাষ্পের অভাব পূর্ণ করিতেছে।

এক সমুদ্রই অঙ্গারকবাষ্প শোষণ করে না। সমুদ্রের জলে যে সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহারাও ঐ বিষাক্ত বায়ুকে গ্রাস করে। বায়ুরাশিতে যে অঙ্গারকবাষ্প

মুক্তাবস্থায় আছে, এক সমুদ্রের জলই তাহার প্রায় ২৭ গুণ শোষণ করিয়া রাখিতেছে। তা' ছাড়া জলমিশ্রিত কার্ব্বনেট্ ও বাইকার্ব্বনেট্ প্রভৃতি নানা যৌগিক পদার্থগুলি যে কত বাষ্প কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন কারণে বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বা কমিয়া আসিলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। বিশ্বনাথ সৃষ্টি রক্ষার জন্য সমুদ্রজলে এমন একটি ধর্ম্ম যোজনা করিয়া দিয়াছেন যে, আকাশে অঙ্গারকবাষ্পের আধিক্য হইলে সমুদ্র জলই সেই অনাবশ্যক বাষ্পকে শোষণ করিয়া লইবে, এবং তার পর কোন কালে সেই বাষ্পের অভাব হইলে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে সেই সমুদ্রই অভাব মোচন করিতে থাকিবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। শীতাতপ আঘাত উত্তেজনা প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে ঠিক একপ্রকারেই কার্য্য করে। কিন্তু অঙ্গারক বাষ্পের কার্য্যটা উহাদের উপর ঠিক বিপরীত হইতে দেখা যায়। উদ্ভিদ সকল অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিলেই পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু কোন প্রকারে সেই একই বাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য্য সুরু করিয়া দেয়। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এবং প্রাণীর বর্জ্জনীয় বাষ্পটিকে বিধাতা যে কৌশলে বায়ুমণ্ডলে নিয়মিত রাখিয়া উভয়েরই সুখ স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

যেমন মূল সত্য, আমাদের নিকট অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হইলেও—ক্যাণ্টের ভাষা অনুসারে—তাই বলিয়া উহা কম অপেক্ষিক ও কম বিষয়ীগত নহে, (Subjective) সেইরূপ নৈতিক সত্যও আমাদের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা কম বিষয়ীগত নহে; কিন্তু যদি ক্যাণ্টের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতাতে আসিয়াই থামা যায়, তাহাহইলে অজ্ঞাতসারে সত্য ও মঙ্গলকে—একেবারে ধ্বংস করা না হউক,—দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়।

মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী প্রভেদ আছে সেই প্রভেদের মধ্যেই অবশ্যকর্ত্তব্যতার পত্তনভূমি; আবার অবশ্য কর্ত্তব্যতা, যুক্তি অনুসারে স্বাধীনতার পত্তনভূমি। যদি মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে,তাহা হইলে অবশ্য সেই কর্ত্তব্য সাধন করিবার শক্তিও তাহার থাকা চাই;—ধর্ম্মনিয়ম পালন করিবার জন্য, বাসনা ও প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্যও থাকা চাই, মানুষের স্বাধীনতা থাকা চাই; বস্তুতও মানুষ স্বাধীন—তাহা না হইলে, মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়। অবশ্যকর্ত্তব্যতার সাক্ষাৎ নিশ্চিততার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধীনতার নিশ্চিততা আপনিই আসিয়া পড়ে।

অবশ্য, ইহা স্বাধীনতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ; কিন্তু Kant যে মনে করেন, ইহাই স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ প্রমাণ—এইটিই Kant-এর ভুল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি সাক্ষীচৈতন্যের প্রমাণ না মানিয়া, কেবল যুক্তির প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন।

যুক্তির প্রমাণ কি আত্মচৈতন্যের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়া আবশ্যক নহে? আমার স্বাধীনতা আমার কি একটা নিজস্ব জিনিস নহে? পরীক্ষাবাদের সম্বন্ধে (Empirism) তাঁহার বিষম ভয় না থাকিলে, সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্য তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা হইলে যুক্তির উপরেও অসীম বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় না। আমরা যেরূপভাবে পৃথিবীর গতিকে বিশ্বাস করি, সেরূপভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে ক্রমাগত স্বাধীনতার ভাব অনুভব করি বলিয়াই আমরা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি।

একথা কি সত্য—কোন একটা কাজ উপস্থিত হইলে, সে কাজটা করিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিতেও পারি, নাও করিতে পারি?—এই প্রশ্নটির মধ্যেই সমস্ত স্বাধীনতার সমস্যা বিদ্যমান।

কাজ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি—এই দুইয়ের পার্থক্য প্রথমে নির্দ্ধারণ করা যাউক। অবশ্য, আমাদের অধিকাংশ মনোবৃত্তিই আমাদের ইচ্ছার সেবায় নিযুক্ত ও ইচ্ছার শাসনাধীনে অধিষ্ঠিত; কিন্তু এই ইচ্ছার আধিপত্য প্রকৃত হইলেও নিতান্ত সীমাবদ্ধ; আমি আমার বাহুকে নাড়াইতে ইচ্ছা করি,—অনেক সময়েই নাড়াইতে সমর্থ হই। কিন্তু আমার পেশীসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে আমি অনেক সময় আমার বাহুকে নাড়াইতে সমর্থ হই না, ইত্যাদি; কার্য্যের সম্পাদন সব সময়ে আমার উপর নির্ভর করে না; কিন্তু সব সময়েই আমার উপর নির্ভর করে কি?—না আমার কার্য্য করিবার সঙ্কল্প। বাহিরের চেষ্টা নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্কল্প কখনই নিবারিত হইতে পারে না। নিজ ইচ্ছার রাজ্যে ইচ্ছাই সর্ব্বময় অধিপতি।

ইচ্ছার এই সর্ব্বময় আধিপত্য আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি। ইচ্ছাশক্তি কি প্রকারে প্রযুক্ত হইবে, প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই আমার অন্তরে তাহা অনুভব করি। যখন আমরা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি, সেই সময়ে আমরা ইহাও অনুভব করি যে উহার উল্‌টাটা করিতেও আমরা সমর্থ; আমি অনুভব করি, আমি আমার সঙ্কল্পের প্রভু—ঐ সঙ্কল্প আমি রহিত করিতেও পারি, সমানভাবে রক্ষা করিতেও পারি, পুনর্গ্রহণ করিতেও পারি। আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজটা রহিত হইলেও, ইচ্ছা করিলে উহা যে আমি করিতে পারি—এই অনুভবটি রহিত হয় না। ইচ্ছাশক্তির সহিত এই অনুভবটি সর্ব্বদাই অবস্থিত; এই অনুভবটি ইচ্ছার সমস্ত বহিরভিব্যক্তির উপরে। অতএব স্বাধীনতাই ইচ্ছাশক্তির মুখ্য উপাধি, এবং এই উপাধিটি ইচ্ছার সহিত চিরবিদ্যমান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি বাসনাও নহে, প্রবৃত্তিও নহে, বরং ঠিক্ তাহার বিপরীত। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতা—বাসনা ও প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। বাসনা ও প্রবৃত্তিতেই মানুষের দাসত্ব, ইচ্ছাতেই মানুষের স্বাধীনতা। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার প্রভেদ যদি অন্যত্রও রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে মনস্তত্ত্ববিদ্যাতে এই প্রভেদ স্থাপন করা কর্ত্তব্য—এই দুইকে এক করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। যখন প্রবৃত্তিসমূহ নিজ খেয়ালের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে;—ইহাকেই উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। যখন অন্য প্রবৃত্তিসমূহ একটা কোন বিশেষ উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে

তখনই তাহা অত্যাচার ও উৎপীড়নে পরিণত হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই স্বাধীনতা। কিন্তু এই সংগ্রামের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই; এই উদ্দেশ্যটি কি? না—বিবেকের আদেশ পালনরূপ কর্ত্তব্যসাধন। আমাদের বিবেক এবং বিবেক যে ন্যায় ধর্ম্মকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে সেই ন্যায় ধর্ম্মই আমাদের প্রকৃত নিয়ন্তা ও প্রভু। বিবেকের অনুসরণ করাই ইচ্ছার নিজস্ব নিয়ম, এবং সে ইচ্ছা ইচ্ছাই নহে যে এই নিয়মের অধীন না হয়। যতক্ষণ না বিবেক,—বাসনা প্রবৃত্তি ও স্বার্থের বেগকে ন্যায়ের দ্বারা প্রতিরোধ করে, ততক্ষণ আমাতে আর আমি থাকি না। বিবেক ও ন্যায়ধর্ম্মই প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে এবং মুক্ত করিয়া আর একটা কিছুর দাসত্ব আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় না। কারণ—ন্যায়ধর্ম্মের অনুসরণে স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করা হয় না—প্রত্যুত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হয়, স্বাধীনতার বৈধ ব্যবহার করা হয়।

স্বাধীনতাতে এবং বিবেক ও ন্যায়ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার ঐক্য সাধনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মানুষ বিবেকের আলোকে আলোকিত স্বাধীন জীব বলিয়াই মানুষকে পুরুষ বলা যায়।

স্বাধীনতা থাকা কিংবা না থাকা, ইহাতেই একটা জিনিসের সহিত পুরুষের প্রভেদ। জিনিস কি? না যাহা স্বাধীন নহে—সুতরাং যাহা আপনার নিজস্ব নহে, যাহাতে আপনাত্ব কিছুই নাই; শুধু গণনার হিসাবে তাহার একটা পৃথক্ সত্তা আছে মাত্র—সে পৃথক্ সত্তা পুরুষের ন্যায় প্রকৃত পৃথক্‌সত্তা নহে, উহা পৃথক্ সত্তার একটা অসম্পূর্ণ নকল মাত্র।

নিজের উপর, জিনিসের কোন অধিকার নাই; যে কেহ প্রথমে আসিয়া জিনিসকে গ্রহণ করে এবং আপনার বলিয়া চিহ্নিত করে—জিনিস্ তাহারই। কোন জিনিসই নিজের নড়াচড়ার জন্য দায়ী নহে, কেন না সে, ইচ্ছা করিয়া নড়াচড়া করে না, এমন কি, সে নড়াচড়া করিতেছে কি না তাহা জানেও না। দায়িত্ব কেবল পুরুষেরই আছে; কেন না, পুরুষ বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীন; এবং এই বুদ্ধি ও স্বাধীনতার জন্যই পুরুষ দায়ী।

জিনিসের কোন আত্মমর্য্যাদার ভাব নাই; পুরুষেরই আত্মমর্য্যাদা আছে।

জিনিসের নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই—পুরুষ জিনিসের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করে তাহাই জিনিসের মূল্য। পুরুষ জিনিসকে ব্যবহার করাতেই জিনিসের যাহা কিছু মূল্য—জিনিস পুরুষের সাধনোপায় মাত্র।

অবশ্যকর্ত্তব্যতার সহিত স্বাধীনতার অস্তিত্ব ভিতরে ভিতরে জড়িত; অর্থাৎ ইহা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য এইরূপ বলিলে—ইহা করিবার স্বাধীনতা আমার আছে—এইরূপ বুঝাইয়া যায়। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে কর্ত্তব্যও নাই এবং যেখানে কর্ত্তব্য নাই সেখানে অধিকারও নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

কে আমি? কিছুই নই শুধু ধুলিসার,
যা কিছু পেয়েছি, সবি তব করুণার।
পথ আমি চিনিনাক, তব লক্ষ্য ধরে,
হইতেছি অগ্রসর এ সংসার পরে।
কত ভয়, কত শঙ্কা এ ভীরু পরাণ
কেন না নিশ্চিন্ত হয়, করি সব দান
তোমার চরণ তলে? আমার ভাবনা
ভবিষ্যের, কত মোর সহস্র বেদনা

তারে ভয় করি আমি, দুর্ব্বোধ হৃদয়
কেন গো তোমারে সঁপি নিশ্চিন্ত না হয়!
আমার অদৃষ্টে ওগো ভাগ্যের দেবতা,
আমার সকল সুখ, সব দুঃখ ব্যথা
তব দত্ত তব দান, কৃতজ্ঞতা ভরে,
রাখিব যা দিবে তুমি যতনে আদরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

প্রার্থনা।

দয়াময় জগদীশ তুমি বিনা আর,
কে বুঝিবে হৃদয়ের রাগিণী আমার।
সুখ উছলিত প্রাণ, তবু আঁখিকোনে
কেন অশ্রু ঝরে বিভু, বল তুমি বিনে
কে জানিবে? এত সুখ, আনন্দ মাঝার
কার দয়া রাশি, বুকে জাগে অনিবার।
অতি দীন অতি দুঃখী ছিল যে হৃদয়
এ সৌভাগ্য সুখ লভি পূর্ণ সমুদয়।
কাঙালিনী ছিনু আমি। অমূল্য রতন
দিয়াছ আমারে বিভু হৃদয় গগন
পরিপূর্ণ সুখভরে; তব দত্ত দান
তোমারি চরণে সঁপি দেছি ভগবান।
তুমি দয়া করে ওরে রেখ স্নেহছায়,
তব দয়া লভি হোক, ধন্য এ ধরায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা কথা।

আমেদিয়া-সম্প্রদায়।

আজ কয়েক মাস হইল কলিকাতা টাউন-হলে যে ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল, তাহাতে মির্জ্জা গোলাম আমেদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আমেদিয়া-সম্প্রদায়ের মতামত আলোচিত হয়। তাঁহাদের "message of peace" অর্থাৎ শান্তি-বাণী নামক ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশ হইতে ঐ পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সহিত অনেকে মিলিয়াছেন। উক্ত মতপ্রবর্ত্তক promissed Messiah ও Mahdi বলিয়া আপনাকে বিঘোষিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক তাঁহার পুস্তকখানি সহৃদয়তা ও উদারতায় পরিপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন "স্বদেশীয়গণ! আমরা সকলে হিন্দু বা মুসলমান, আমাদের মধ্যে শত শত মতভেদ থাকিলেও জগতের স্রষ্টাপাতা বিধাতা এক ঈশ্বরে আমরা সমবিশ্বাসী। আমরা যে কেবল মনুষ্য বলিয়া এক লক্ষ্য পরায়ণ তাহা নহে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, পরস্পরের প্রতিবেশী। যাহাতে আমরা সকলে বন্ধুভাবে অবস্থান করিতে পারি, কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল বিষয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কেননা আমরা একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, যে ধর্ম্ম অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে বলে না; সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে, যাহার ভিতরে সমবেদনা নাই। সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমান বিচার, তিনি মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন নাই। যে শক্তি যে গুণ তিনি ভারতের পূর্ব্বতন লোকের মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই তিনি কি আরবীয় কি পারসিক, কি সিরীয়, কি চীনদেশীয়, কি জাপানী, কি ইউরোপীয়, কি আমেরিকান সকলের মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সকলেই সমান ভাবে বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি হইতে উপকার লাভ করিতেছে, বসুন্ধরা সকলকেই সমানভাবে শস্যে ফল ফুলে সেবা করিতেছে। ইহা হইতেই আমরা এই স্বর্গীয় সত্য ও শিক্ষা লাভ করি যে আমাদিগকেও অপরের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণমনা হইয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দু ও মুসলমান যে কেহ এই প্রগাঢ় সত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাহার বিরোধী হইবে, কেবল যে সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ও অশেষ কষ্ট ভোগ করিবে, তাহা নহে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণকেও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। বিধাতা প্রদর্শিত নীতি বারিতেই জীবন পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহারই অবলম্বনে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোরাণের প্রথমেই আছে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু সৎ, তাহা ঈশ্বরে বর্ত্তমান, যিনি এই সমস্ত জগতের রাজা। সকল দেশের সকল কালের লোক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের এই সকল মহৎ ভাবের প্রকাশ কোন জাতিবিশেষের সম্মুখে হয় নাই বা অপরজাতিকে ঈশ্বর এককালে বিস্মৃত হন নাই বা তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টান ও য়িহুদিরা এখনও বিশ্বাস করেন যে ধর্ম্ম প্রবক্তাগণ নিরবছিন্ন এসরাইল বংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ঈশ্বর অপরাপর জাতির উপর একেবারেই বিরূপ। এমন কি যিশুখৃষ্টের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, তিনি কেবল এসরাইল জাতির অন্তর্গত (lost sheep) বিভ্রান্ত মেষগণের জন্য (মনুষ্যের উদ্ধারার্থ) আসিয়াছেন। এ কথায় খৃষ্টের দেবত্বের পরিচয় মিলে না। খৃষ্ট কি কেবল এসরাইল জাতির দেবতা, তিনি কি অন্য কোন জাতির নহেন, যে অপর জাতির সংস্কার বা পরিচালনার সঙ্গে তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। য়িহুদি ও খৃষ্টীয় বিশ্বাসের মধ্যে ইহাই মিলে যে য়িহুদিগণের মধ্যেই সকল ধর্ম্ম প্রবক্তা আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কেবলমাত্র একটি জাতির নিকট সত্যগ্রন্থগুলি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। খৃষ্টানগণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে যিশুতেই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের নিকট হইতে মনুষ্যের প্রতি প্রত্যাদেশের পথ চিরকালের জন্য একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর্য্যসমাজের মধ্যেও অনুরূপ মতের পরিচয় মিলে। তাঁহারা বলেন যে প্রকৃত

আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে নাই। কেবল চারিজন ঋষিকে নির্ব্বাচন করিয়া ঈশ্বর তাঁহার সত্য তাঁহাদিগের নিকট কেবল সংস্কৃত-ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; উহাই বেদ। কিন্তু কোরাণের ভাব অন্যরূপ। কোরাণে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে "এমন কোন জাতি নাই, যাহার মধ্যে সতর্ক করিবার জন্য ধর্ম্ম উপদেষ্টা প্রেরিত হয় নাই"। ঈশ্বর যেমন যথাযোগ্যরূপ কামনার বিষয় সকল মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে বিধান করেন, তেমনি তিনি সকলের আত্মার কল্যাণের জন্য তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকেন। তিনি দেশ বা জাতি বিশেষের পরিপোষক নহেন, তিনি সমস্ত দেশের সকল কালের, সকল মনুষ্যের পরিপোষক, সকল করুণার নিদান, দৈহিক আধ্যাত্মিক সকল শক্তির মূল, সকলের আশ্রয়! তাঁহার করুণা সকল দেশের সকল কালের মানবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কাহারও বলিবার সাধ্য নাই যে তিনি দেশ বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষের উপরে তাঁহার করুণা বর্ষণ করেন, অপর জাতি বা দেশ সকলকে তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তিনি জাতি বিশেষের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, অপর জাতির নিকট তিনি প্রকাশিত হয়েন না, তিনি ইঙ্গিত বা অলৌকিক কার্য্যে এক সময়ে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে লুক্কায়িত আছেন। কেহই কোন যুগে তাঁহার করুণার বাহিরে থাকিতে পারে না, কেহই তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত নহে।

ঈশ্বরের ভাব, সত্য সত্যই, এমনই উদার। আমা-দিগকে সেই উদারতার অনুসরণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশেই এই পুস্তকখানি আপনাদের হস্তে অর্পণ করি-তেছি, এবং প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর সকলের অন্তরে সত্যের ভাব জাগ্রত করিয়া দিন, পরস্পরের ভিতরে সহানুভূতি বিকশিত করুন। বন্ধুগণ! পরলোকের তত্ত্ব বহু লোকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত, কেবল তাঁহাদেরই সুবিদিত, যাঁহারা জীবিত থাকিয়াও মৃত, অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত।

আপনারা সকলেই জানেন যে একতা ও মিলন সকল প্রকার অসুবিধা ও বিঘ্নকে বিদূরিত করিয়া দেয়। যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা একতা লাভের জন্য সচেষ্ট হউন। হিন্দু ও মুসলমান আমরা একই দেশে বাস করি-তেছি ও আমরা কখন মনেও করিতে পারি না যে ইহাদের মধ্যে এক জাতি অপর জাতিকে এই ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবে। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এদেশে নানা কারণে নানা বন্ধনে এমনই বিজড়িত, যে উভয়ের মধ্যে সেই বন্ধন রজ্জুকে বিচ্ছিন্ন করা অস-ম্ভব। যদি কখন এদেশে বিনাশের কারণ আসিয়া উপ-স্থিত হয়, হিন্দু মুসলমান ইহাদের মধ্যে কোন এক জাতি রক্ষা পাইবে না, উভয়কেই মরিতে হইবে। যদি ইহাদের মধ্যে এক জাতি অপরকে ঔদ্ধত্য সহকারে ঘৃণিত করি-বার চেষ্টা করে, অপর জাতিকেও ঘৃণিত হইতে হইবে। যদি এক জাতি অপর জাতির প্রতি মমতা বা সমবেদনা প্রকাশ না করে, অপর জাতিকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি এক জাতি অপর জাতির বিনাশ সাধনে উদ্যত হয়, তবে তাহার ঠিক সেই অবস্থা, যে বৃক্ষের সেই শাখা কাটিতে উদ্যত, যাহার উপর সে বসিয়া আছে। আপনারা এক্ষণে সুশিক্ষিত, অনুকূল সময় আসিয়া উপস্থিত; পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ও ঘৃণা পরিহার করিতে হইবে, সকলকে সখ্য ও মৈত্রীর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তোমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহার প্রভাবে স্বদেশীয় ও প্রতিবেশীর উপরে তোমার সমবেদনা জাগিয়া উঠুক। একে ত সংসাররূপ মরুভূমির মধ্যে আমাদিগকে বিচরণ করিতে হয়, তাহার উপর প্রখর সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রচণ্ড উত্তাপ আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। এই উত্তাপ ও পিপাসা শান্তি করিবার একমাত্র ঔষধ মিলন ও একতার স্নিগ্ধ বারি।

বর্ত্তমানে যে দুর্য্যোগ চলিতেছে, তাহার জন্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপনের বিশেষ আবশ্যক। আমরা নানা পরীক্ষা ও দুর্নিমিত্তের মধ্যে পড়িয়াছি। ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ প্লেগ সর্ব্ব-নাশ সাধন করিতেছে, এবং ঈশ্বর আমাকে বলিতে-ছেন, যদি লোকে অনুতাপ পরায়ণ হইয়া অসৎ কর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত না হয়, বিপদের পর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। সকলে সাবধান হও। এইরূপ ঘোর বিপদ আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান মিলিত হও।

আপনারা বলিতে পারেন যে ধর্ম্ম-বিষয়ক পার্থক্য এতই অধিক যে মিলন হইতেই পারে না। কিন্তু ভগ-বানের আদেশ লক্ষ্য করিয়া চলিলে ধর্ম্মের পার্থক্য বাধা দিতে পারে না। যাহা কিছু পার্থক্য আছে সকলেরই মীমাংসা হইতে পারে, যদি জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি পথ-প্রদর্শক হয়। যখন এক সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবক্তাকে অকারণ নিন্দা করে, ধর্ম্মগ্রন্থ গুলিকে প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া ঘোষণা করে, তখনই উভয় জাতির মধ্যে পার্থক্য ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়।

যাঁহারা উভয় জাতির সম্মিলন প্রয়াসী তাঁহারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, যে কোরাণের শিক্ষা বেদের শিক্ষার বিরোধী নহে। যাঁহারা আর্য্য-সমাজের অন্তর্ভূত তাঁহারা বলেন বেদের ভিতরেই ঈশ্বরের সমস্ত বাণী নিহিত। কিন্তু এই হিন্দুজাতির ভিতরে পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, অসংখ্য লোক তাহাদের অনুবর্ত্তী এবং তাহারা স্বীকার করে, যে ঐ অবতারগণ স্বর্গীয় সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে ঈশ্বরের সত্যের প্রকাশ যে কেবল বৈদিক সময়ে হইয়াছিল এবং বেদেই তাহা নিহিত, একথা অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা যাইতে পারে। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে, ইহাও বলে যে স্বর্গীয় সত্যের প্রকাশ (divine revelation) তাঁহার নিকট হইয়াছিল। এমন কি তাহারা এতদূর পর্য্যন্তও বলিয়া থাকে যে, কৃষ্ণ দেহধারী ঈশ্বর।

হিন্দুধর্ম্মের শেষযুগে নানকের আবির্ভাব। তাঁহার নিষ্ঠা ও পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার নাই। তাঁহার দলস্থ লোক, যাহারা শিখ বলিয়া খ্যাত, বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন, যে স্বর্গীয় সত্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। "গ্রন্থ" ও "জনম সাক্ষী" পুস্তকে তাহার

পরিচয় পাওয়া যায়। উহার এক স্থানে আছে যে ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছেন, যে মুসলমান-ধর্ম্ম সত্য। এই কারণে তিনি মক্কা তীর্থে যাত্রা করেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের আদেশ পালন করিতেন। সত্য সত্যই তিনি ঈশ্বরের নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার প্রেমের রসাস্বাদন করিতে দিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে হিন্দু, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষপাতী। দেরাতে নানকের যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তাহার গাত্রে কোরাণের এই কথাই সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে "ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদই তাহার প্রচারক"। তিনি সাধনা প্রভাবে নির্ম্মল চরিত্রগুণে ধর্ম্মের এমন নিগূঢ় তত্ত্ব সকল জানিতে পারিয়াছিলেন, যাহা পণ্ডিতগণের নিকটেও অপরিজ্ঞাত ছিল। হিন্দুজাতির উপরে তাঁহার অবিচলিত প্রেম, অথচ মুসলমানের উপরে হিন্দুজাতির যে ঘৃণা আছে, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য, তিনি যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দু-সমাজ যদি নানকের আদেশ প্রতিপালন করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে পার্থক্য বিদূরিত হইত এবং উহারা এক জাতিতে পরিণত হইত।

ঈশ্বরের বাণী ও তাঁহার প্রকাশের বিরাম নাই। তিনি পুরাকালে যেমন আবির্ভূত হইতেন, এখনও তেমনি প্রকাশিত হয়েন। তিনি এখনও আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করেন। তাঁহার মহৎ ভাবের খর্ব্বতা নাই। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার কথা শুনিতেছি।

শত শত ইঙ্গিত তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কোন জাতিই নাই, যাহার সম্মুখে তাঁহার প্রকাশ হয় নাই। বেদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ নিবৃত্তি পায় নাই। যাঁহার সূর্য্য সকলকে আলোক দিতেছে যাঁহার বৃষ্টি দেশ নির্ব্বিশেষে নিপতিত হইতেছে, এমন কি হইতে পারে যে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুদারভাবে জাতিবিশেষের উপরে বিশেষকালে বিশেষ ভাষায় তাঁহার কৃপা বিতরণ করিবেন। হিব্রুগণ বলেন যে এসরাইল জাতি, ঈশ্বরের প্রিয় জাতি এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কেবল তাহাদেরই মধ্যে সম্ভব। জেরোয়াষ্টার ধর্ম্মভুক্তগণ বলেন তাঁহাদের ধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্ম হইতেও প্রাচীন। এইরূপ ধারণাই অন্য ধর্ম্মের উপরে বিরাগ আনয়ন করে। সকলেই আপনাপন ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে বিব্রত। এতদিন কেহই বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা পান নাই। গৌতম বুদ্ধ ঐক্য স্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বেদের দেবত্বে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাই লোকে অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক বলিয়া তাঁহার নিন্দা ঘোষণা করিল। ভারতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইল না বটে, কিন্তু দেশ দেশান্তরে তিনি বিজয়ী হইলেন। সমগ্র মানব সমাজের এক তৃতীয়াংশ লোক তাঁহার শিষ্য। রুশিয়া আমেরিকায়ও এ ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতেছে।

অসংখ্য মনুষ্য যে ধর্ম্ম-প্রবক্তাকে সম্মাননা করে, যদি সেই বিদেশীয় ধর্ম্ম-প্রবক্তার নিন্দাবাদে আমরা প্রবৃত্ত হই, তবে উহা হইতে যে বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আমাদের দেহ আত্মা উভয়ই জর্জ্জরিত হইবে। বিবাদ কলহে শান্তি নাই, আরাম নাই, আমরা মুসলমান, আমরা অন্য দেশের ধর্ম্ম প্রবক্তাগণের নিন্দা ঘোষণা করি না। ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রবক্তাগণকে যে সম্মান দিয়াছেন, অপরের পক্ষে তাহা দুর্লভ। বেদের অনুবর্ত্তী হইয়া ও লোকে এক ঈশ্বরকে পূজা করে না; কেহ বা সূর্য্যকে কেহ বা অগ্নিকে কেহ বা গঙ্গাকে কেহ বা অসংখ্য দেবতাকে পূজা করে। বেদের ধর্ম্ম এমনই জটিল যে তাহারা সকলেই বেদ হইতেই অনুরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করে। আর্য্য সমাজীরা অগ্নি বায়ু জল অর্থে ঈশ্বরই বুঝেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যা সমগ্র হিন্দুসমাজের ভিতরে এখনও গৃহীত হয় নাই। বেদের ভিতর ঘোর আপত্তিকর নিয়োগ-বিধি রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে বেদের ভিতরে উহা অনুপ্রবিষ্ট হওয়াই সম্ভব। তজ্জন্য আমরা বেদের আদৌ নিন্দাবাদ করি না। কিন্তু তাহা সত্বেও আর্য্য-সমাজের লোকেরা আমাদের উপর বিরূপ। আর্য্যসমাজের লোকেরা যদি হজরত মহম্মদকে প্রবক্তা বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা অমেদিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বেদ ও ঋষিগণকে সম্যক শ্রদ্ধা করিতে প্রস্তুত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ নিয়ম-পত্র লিখিত হউক, যে অপরের নিন্দাবাদ করিবে, তাহাকে দণ্ডস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা দিতে হইবে! আমেদিয়া সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা এক্ষণে প্রায় চারিলক্ষ। স্বদেশীয়গণ! শান্তির সমান আর কিছুই নাই। আমাদের মধ্যে কত বিবাদ বিসম্বাদ বর্ত্তমান। ইহা বিদূরিত করিবার আর অন্য উপায় নাই। কোরাণ শান্তির কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কোরাণে আছে "বিশ্বাসীগণ বল যে আমরা জগতের সমস্ত ধর্ম্ম প্রবক্তাকে বিশ্বাস করি, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য রাখি না, কাহাকেও গ্রহণ করিতে গিয়া অপরকে পরিত্যাগ করি না"। এমন উদার ভাব আর কোথায় আছে। যাহারা অন্য ধর্ম্মের ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণকে নিন্দা করে তাহারা যে কেবল ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী তাহা নহে, তাহারা বিবাদের বীজ প্রোথিত করে। ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন "প্রতিমা বা প্রতিমাপূজককে গালি দিও না, তাহারা তোমার ঈশ্বরকে গালি দিবে, কেন না, তাহারা ঈশ্বর কি, তাহা জানে না। কিন্তু লোকে হজরত মহম্মদের নিন্দা করে। মহম্মদের প্রতি মুসলমানগণের এমনই শ্রদ্ধা, যে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র মুসলমানরাজা তাঁহার সিংহাসন হইতে অবতরণ করেন এবং আপনাদিগকে তাঁহার দাসের ন্যায় জ্ঞান করেন। তাঁহার নিন্দাবাদ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

যখন ধরা পাপে পরিপূরিত হয়, পাপের মাত্রা পুণ্যের মাত্রাকে অতিক্রম করে, তখনই ঈশ্বর একজনকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। রোগ হইলেই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যখন বেদের উৎপত্তি হয়, তখন কিছু পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয় নাই। মহম্মদ যখন আবির্ভূত হন, তখন চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। জনেক ইউরোপীয় মিসনরি Rev. Pfender নিজেই Mizan-ul-Haq নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে সে সময়ে খ্রীষ্টিয়ানগণের বিলক্ষণ পতন হইয়াছিল। তাহার খ্রীষ্টি-

স্থান নামে কলঙ্ক আনিয়াছিল। কোরাণেই আছে যে সে সময়ে "দেশ ও সমুদ্র সকলই কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল।" মহম্মদ আসিয়া কি করিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য আরব জাতির সংস্কার। সে সময়ে তাহারা মনুষ্য নামের যোগ্য ছিল না। চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি নরহত্যা ব্যভিচার তাহাদের কার্য্য ছিল। মদিরাপানে দ্যূতক্রীড়ায় তাহারা রত হইত। কিন্তু মহম্মদ অল্প দিনের ভিতরেই তাহাদিগের ভিতরে অলৌকিক উন্নতি সাধন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে অনেকেই তাঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন। এমন কি মহম্মদের প্রাণনাশ করিবার তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহারা আপনাদের বিলাস বিভব সকলই বিসর্জ্জন দিয়া মহম্মদেরই শরণাপন্ন হইল। অনেকে বলেন যে মহম্মদ তরবারির সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু এ কথা একেবারেই সঙ্গত নহে। ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। মক্কা হইতে কয়েক মাইল দূরে হীরা পর্ব্বত-গুহায় তিনি লুক্কায়িত ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন। একদিন ঈশ্বর তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন পৃথিবীস্থ জনগণ ঈশ্বরের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, পাপে কলঙ্কিত হইয়াছে। আমি তোমাকে প্রবক্তা apostle নিয়োগ করিলাম, তুমি সকলকে সাবধান কর, নচেৎ ঘোর শাস্তি তাহারা প্রাপ্ত হইবে। হজরত বলিলেন আমি যে নিরক্ষর। ঈশ্বর তখন তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন এবং স্বর্গীয় জ্ঞান তাহাতে নিহিত করিলেন। হজরত সেই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে অনেককে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তিনি যে আবাসে অবস্থান করিতেন, শত্রুগণ সেখানে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে রক্ষা করিতে চান, কে তাহাকে বিনাশ করিতে পারে। হজরত আবু বেকারের সঙ্গে মদিনায় পলায়ন করিলেন। পথে শত্রুহস্তে তাঁহার জীবনসংশয়; তথাপি তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। মদিনায় গিয়া তিনি অনেককে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ইহাতে মক্কার লোকের ক্রোধের আর অবধি রহিল না। যাহারা মক্কায় থাকিয়া ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে বিদেশে পলায়ন করিল, কেহ বা আবিসিনিয়ার রাজার আশ্রয়ে চলিয়া গেল। যাহারা দরিদ্র মুসলমান, তাহাদের উপর নির্য্যাতনের আর সীমা রহিল না। মক্কার অধিবাসীগণ, সেই মুসলমানদিগের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে ধরিয়া ঘোর নিষ্ঠুরতার সহিত বিনাশ করিতে লাগিল। সে নিষ্ঠুরতা ঈশ্বরের দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি মহম্মদকে বলিলেন, আমি আর্ত্তনাদ আর শুনিতে পারি না, অত্যাচারীগণকে বিনাশ কর, যাহারা নিরপরাধগণকে হত্যা করিয়াছে, তরবারি তাহাদিগকে বিনষ্ট করুক। তাহাই হইল। ইহারই নাম "জেহাদ"। সত্য সত্য তরবারির সাহায্যে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। বরং কোরাণে আছে "মুসলমানধর্ম্মে বাধ্যতা নাই" অর্থাৎ জোর করিয়া কাহাকে এ ধর্ম্ম দীক্ষিত করিও না। মুষ্টিমেয় মুসলমান অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিল। তাহারা নিজের রক্ত দিয়া মুসলমানধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের একত্ব স্থাপন করিতে তাহারা এমনই লালায়িত হইয়াছিল, যে তাহারা আফ্রিকার মরুভূমে, চীন-দেশে তাহারা সৈনিকের বেশে নহে, কিন্তু দান—প্রচারক রূপে গমন করিয়া বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইল। বৈরাগ্যের বেশে ভারতে আসিয়া, এ ধর্ম্ম তাহারা প্রচার করিল। ইউরোপের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া, এ ধর্ম্মের সমাচার ঘোষণা করিল। সকল দেশের সকল জাতির প্রতি এ ধর্ম্মের দৃষ্টি, ঐক্য স্থাপনই এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। খৃষ্ট-ধর্ম্মের মত নহে, যে যিশু কেবল এসরাইল জাতির জন্য আসিয়াছিলেন। যিশুর নিকটে এক সময়ে একটি অপর জাতীয় স্ত্রীলোক আসিয়া বলিয়াছিল "প্রভু আমার প্রতি কৃপা কর"। যিশু তাহা শুনিয়া বলিলেন, আমি কেবল এসরাইল জাতির জন্য আসিয়াছি। সেই স্ত্রীলোক আবার প্রার্থনা জানাইল, যিশু কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। কিন্তু কোরাণে আছে যে মহম্মদ সমস্ত জাতির জন্য আসিয়াছিলেন। উপরে যাহা বলিলাম তাহার জন্য যিশুকে নিন্দা করিতেছি না, কেন না তাঁহার প্রচার তখন কেবল এসরাইলগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মুসার শিক্ষার ভিতরে আমরা প্রতিহিংসার আদেশ দেখিতে পাই, কিন্তু যিশুর শিক্ষাতে ক্ষমা ও দয়ার কথার বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু কোরাণ মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কোরাণের আদেশ এই যে মুসার আদেশানুযায়ী, অপরাধীকে তাহার অপরাধ-বিবেচনায় দণ্ড দিবে, এবং যিশুর আদেশানুযায়ী ক্ষমা প্রদর্শন করিবে, যখন বুঝিবে ক্ষমা প্রভাবে অপরাধীর চৈতন্যোৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।

আনুষ্ঠানিক দান—পরলোকগত কলিকাতা Corporation এর Health Officer Dr. R. Sen এর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী দশ টাকা ও ভাগলপুর নিবাসী পরলোক গত বামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার জনৈক আত্মীয় দুই টাকা, আদি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদের শান্তিবিধান করুণ ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকের প্রতি।

আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে আপনার নিকট বর্ত্তমান শক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারমূল্য ও মাশুল হিসাবে যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া অগৌণে ঐ টাকা পাঠাইয়া দেন এই পূজার সময়ে এখানকার কর্ম্মচারী ও পাওয়ানাদারদিগের সকল পাওনা ও অগ্রিম-দেয় চুকাইয়া দিতে হয়। আশা করি বিমুখ হইতে হইবে না।

১৮৩১ শক, ১লা আশ্বিন।

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৫ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

একাদশ শ্বাক।

ইতিহাস এই—গৃৎসমদ ঋষি যজ্ঞস্থলে একাকী ছিলেন। ইন্দ্র-শত্রু অসুরেরা তাঁ-হাকে যজ্ঞস্থলে একাকী দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, ইন্দ্র আমাদিগের ভয়ে গৃৎসমদের রূপ ধারণ করিয়া এখানে অব-স্থান করিতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। গৃৎসমদ, 'আমি ইন্দ্র নহি' অসুরদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ইন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করি-তেছেন—

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহত্তঃ পর্ব্বতান্ প্রকুপিতা অরম্নাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভনাৎস জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি গতিশীল পৃথি-বীকে চক্ররেখায় দৃঢ়রূপে স্থাপিত করি-য়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্ব্বত সকলকে স্বস্বস্থানে নিয়মিত রাখিয়াছেন; যিনি অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়া সৃষ্টি করি-য়াছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত রাখি-য়াছেন, তিনিই ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যোহত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্ যোগা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি মেঘকে হনন করিয়া বন্ধন হইতে জল প্রেরণ করিয়া সপ্তসিন্ধুকে পূর্ণ করেন, যিনি বল নামক অসুর কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গো সকল উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যু-দগ্নি উৎপাদন করেন, যিনি যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র (আমি নহি)।

যেনেমাবিশ্বাচ্যবনাকৃতানি যোদাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যোজিগীবাল্লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যাঁহার দ্বারা এই নশ্বর বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি নিকৃষ্ট দাস-বর্ণকে গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় (ব্যাধ যেমন পক্ষী হনন করিয়া তাহাকে গ্রহণ করে) শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র (আমি নহি)।

যংস্মাপৃচ্ছন্তি কুহসেতিঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সোঅর্যঃ পুষ্টীর্বিজইবামিনাতিশ্রদস্মৈধত্ত স জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যে ঘোর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই। যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত

ধন বিনাশ করেন, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তিনি ইন্দ্র (আমি নহি)।

যোরধ্রস্যচোদিতায়ঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্যকীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোবিতাসুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি সমৃদ্ধি প্রদান করেন, যিনি দরিদ্রকে এবং স্তুতিকারী ব্রাহ্মণকে ধন দান করেন, যিনি শোভন হনুবিশিষ্ট হইয়া সোমাভিষবকারী যজমানের রক্ষক, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবোযস্য গ্রামা যস্য বিশ্বেরথাসঃ॥
য সূর্য্যং যউষসং জজান যো অপাংনেতা স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, অশ্ব সমূহ, গ্রাম সমূহ এবং রথ সমূহ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য্যকে এবং উষাকে উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি জল প্রেরণ করেন, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যংক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, একপথগামী দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম বিরোধী শত্রুগণ আত্মরক্ষার্থ যাহাকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দুই জনই যাঁহাকে নানা প্রকারে আহ্বান করে তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যোবিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুত চ্যুৎ স জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, যুদ্ধকালে রক্ষালাভের নিমিত্ত লোকেরা যাহাকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি, এবং যিনি অচ্যুত পর্ব্বত সকলকেও চূর্ণ করেন, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বাজঘান।
যঃ শর্ধতেনানুদদাতি শৃধ্যাং যোদস্যোর্হন্তাসজনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি বজ্র দ্বারা বহু সংখ্যক মহাপাপী অপূজককে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দস্যুগণের হন্তা, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

দ্যাবাচিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্যপর্বতাভয়ন্তে।
যঃ সোমপানিচিতোবজ্রবাহুর্যোবজ্রহস্তঃ সজনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, দ্যাবা পৃথিবী তাঁহাকে নমস্কার করে, পর্ব্বতগণ তাঁহার বলে ভীত হয়, যিনি সোমপাতা, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু ও বজ্রযুক্ত, তিনিই ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আচিদ্বাজং দর্দর্ষি সকিলাসিসত্যঃ।
বয়ন্তইন্দ্রবিশ্বহপ্রিয়াসঃ সুবীরাসোবিদথমাবদেম॥

হে ইন্দ্র, তুমি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সোমাভিষবকারী পাপকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর, অতএব তুমিই সত্য। আমরা প্রিয় ও বীর পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট হইয়া চিরকাল তোমার স্তোত্র পাঠ করিব।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

আমার মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন যিনি সম্মানের যোগ্য; এই জন্য, তাঁহাকে সম্মান করা আমার যেরূপ কর্ত্তব্য সেইরূপ তাঁহার প্রতি অন্যকেও সম্মান প্রদর্শন করাইবার অধিকার আমার আছে। যে পরিমাণে আমার অধিকার—ঠিক্ সেই পরিমাণে আমার কর্ত্তব্য। একটি অপরটির সাক্ষাৎ হেতু। আমার অন্তরস্থ পুরুষ যাহা কিছু করেন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা—অর্থাৎ আমার বুদ্ধি ও আমার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি আমার পবিত্র কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে, অন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার আমার কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু যেহেতু আমার অন্তরস্থ পুরুষটি শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র, সেই হেতু তিনি

আমার নিজের সম্বন্ধে আমার উপর একটি কর্ত্তব্য স্থাপন করেন এবং অন্যের সম্বন্ধে আমাকে একটি অধিকার প্রদান করেন।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পাপ, প্রভৃতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া যেমন আপনার অবনতি আমি নিজে সাধন করিতে পারি না, সেইরূপ অন্যকেও তাহা করিতে দিতে পারি না।

পুরুষ—এক মাত্র পুরুষই অলঙ্ঘনীয়।

এই পুরুষ শুধু যে আত্মচৈতন্যের অন্তরতম মন্দিরেই অলঙ্ঘনীয় তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার সমস্ত বৈধ অভিব্যক্তির মধ্যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মধ্যে, কার্য্যের সমস্ত পরিণামের মধ্যে, এমন কি যাহার দ্বারা পুরুষ আপনার কার্য্যসাধন করিয়া লন সেই উপায় সমূহের মধ্যেও তিনি অলঙ্ঘনীয়।

সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তার পত্তনভূমি ঐখানেই। এই পুরুষই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। পুরুষ হইতেই অন্য সমস্ত সম্পত্তির উৎপত্তি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। সম্পত্তির নিজের কোন স্বত্বাধিকার নাই; সম্পত্তির যিনি অধিকারী তিনিই তাঁহার নিজ চরিত্র, নিজ স্বামিত্ব, নিজ অধিকার সেই সম্পত্তির উপর মুদ্রিত করিয়া দেন।

পুরুষ যখন আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব হারায় তখন তাহার অবনতি না হইয়া যায় না। নিজের উপর পুরুষের যে অধিকার সে অধিকারের হস্তান্তর হইতে পারে না। আপনার উপর পুরুষের যা-ইচ্ছা-তাই করিবার অধিকার নাই; পুরুষ আপনার প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করিতে পারে না, সে আপনাকে বিক্রয় করিতে পারে না, হত্যা করিতে পারে না, এবং যে দুই উপাদানে সে গঠিত—সেই স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেককে সে কোন প্রকারেই রহিত করিতে পারে না।

. শিশুদিগেরও কতকগুলি অধিকার কি জন্য থাকে?—এই জন্য যে, তাহারা পরে স্বাধীন পুরুষ হইয়া উঠিবে। যে পুনর্ব্বার শৈশবদশা প্রাপ্ত হয় সেই অতি বৃদ্ধেরই বা কতকগুলি অধিকার কেন থাকে?—যে নিতান্ত নির্ব্বোধ তাহারই বা কতকগুলি বিশেষ অধিকার কেন থাকে? যেখানে জ্ঞানের উন্মেষ ও যেখানে জ্ঞানের অবশেষ-চিহ্ন দেখা যায় সেখানেও লোকে স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বদ্ধ-পাগল, কিংবা যে বৃদ্ধ 'ভিমরতি'গ্রস্ত হইয়াছে তাহার কোন অধিকার থাকে না কেন? তাহার কারণ, তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে। দাসত্ব প্রথা এত ঘৃণিত হইল কেন? কারণ, ইহাতে করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত করা হয়। এই জন্য কতকগুলি বাড়াবাড়ি আত্মোৎসর্গের কাজও দোষের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। সেরূপ ধরণের আত্মোৎসর্গ করাও দোষ, কাহাকে করিতে বলাও দোষ। মানব-অধিকারের যেটি সারাংশ তাহার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করা,—স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করা, পুরুষের আত্মমর্য্যাদার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করা—এই সকল আত্মোৎসর্গের কাজ বৈধ নহে। স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা কতকগুলি নৈতিক ধারণার উল্লেখ করিলাম—এই সকল নৈতিক ধারণার মধ্যেই স্বাধীনতা অধিষ্ঠিত ও স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অতঃপর আমরা পাপ পুণ্যের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাই নৈতিক ব্যাপারের শেষ উপাদান।

———

মনুর উপদেশ।

আচম্য প্রযতো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ
শুচৌ দেশে জপন্ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি॥

সূর্য্যের উদয়াস্ত উভয় সন্ধিকালে, আচমন করিয়া, সুসংযত হইয়া, শুচিদেশে অনন্যমনে যথাবিধি গায়ত্রী জপ করত উপাসনা করিবে।

যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ
তৎসর্ব্বমাচরেদ্‌যুক্তো যত্রবাস্য রমেন্মনঃ॥

যদি স্ত্রীলোক বা শূদ্রাদিও কিছু শ্রেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান বা উপদেশ করেন, ব্রহ্মচারী যত্নবান হইয়া সে সমুদয় সমাচরণ করিবেন, অথবা তাঁহার যাহাতে মনের প্রসন্নতা হয় তাহাই করিবেন।

ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥

কোন কোন আচার্য্য ধর্ম্ম ও অর্থকে, কেহ বা কাম ও অর্থকে, কেহ বা ধর্ম্মকে, কেহ বা অর্থকে, শ্রেয় বলিয়া থাকেন; পরন্তু ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই শ্রেয়—ইহাই স্থির নিশ্চয়।

আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি; পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্ত্তি; মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥

আচার্য্য, পিতা, মাতা বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও ইহাঁদিগকে, কাহারও—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের—অবমাননা করা উচিত নহে।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্,
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শতবর্ষেও তাহা পরিশোধ করিতে পারা যায় না।

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে।

প্রতিদিন পিতা মাতার ও আচার্য্যের প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে। ইহাঁরা তিন জনে তুষ্ট থাকিলে সমুদয় তপস্যা সমাপ্ত হয়।

তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥

ইহাঁদের তিন জনের শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতেরা পরম তপস্যা বলিয়াছেন। ইহাঁদের অনুমোদিত না হইলে অপর কোন ধর্ম্মের আচরণ করিতে নাই।

ত্রিষ্বপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে॥

এই তিনজনের সম্বন্ধে প্রমাদ না করিয়া যে গৃহী অবস্থিতি করেন, তিনি তিন লোক জয় করেন। এবং তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যিনি এই তিন জনকে আদর করেন, তাঁহার ধর্ম্মকে আদর করা হয়। আর যিনি এই তিন জনের অনাদর করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল হয়।

যাবৎত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতেরতঃ॥

যতদিন ইহাঁরা জীবিত থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কর্ম্ম করিবে না; প্রতিদিন ইহাদেরই প্রিয়কার্য্যসাধন ও সেবাশুশ্রূষা করিবে।

তেষামনুপরোধেন পারত্র্যং যদ্ যদাচরেৎ
তত্তন্নিবেদয়েৎ তেভ্যো মনোবচনকর্ম্মভিঃ॥

ইহাঁদের সেবাদির অবিরোধে পারত্রিক

কর্ম্ম যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, সে সমুদয় ইহাদিগকে নিবেদন করিবে।

ত্রিষেতেষ্বতিকৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥

তিনজনকে উক্তরূপে শুশ্রূষা করিলেই পুরুষের সমস্ত ইতিকৃত্য শেষ হয়। ইহাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তকে (ধর্ম্মের অন্য বাহ্যানুষ্ঠানকে) উপধর্ম্ম বলা যায়।

ধর্ম্ম।

(প্রাপ্ত)

অতি পুরাকাল হইতে মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে ধর্ম্ম কি?—প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে? প্রত্যেক জাতি—এমন কি প্রত্যেক মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ঐ সকল উত্তর বিচিত্র হইলেও, তাহাদের মধ্যে যে একতা আছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া তৎসমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। ক্রিয়াকলাপ।

সকল দেশে এক সময়ে না এক সময়ে হোম, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্যক্রিয়া ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তখনকার বিশ্বাস এই ছিল যে, ঐ সকল বাহ্যক্রিয়া সম্পাদন করিলেই পাপমুক্ত হইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৈদিক কালে যাগ যজ্ঞের বাহুল্য ছিল এবং আর্য্যজাতির নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্য অনেক পরিমাণে ঐ বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। তৎপরে উপনিষদ্ আসিয়া বলিলেন :—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা ঽস্মিন্ লোকে জুহোতি
যজতে তাপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর ইহলোকে হোম যাগ যজ্ঞ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ব্রহ্মদর্শন এবং তাঁহার সহবাসজনিত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই মুক্তি, ইহা প্রচারিত হইল। কিন্তু এই মহদ্ভাব সর্ব্বসাধারণ গ্রহণ করিতে পারিল না। অল্পসংখ্যক সাধক মধ্যে এই উচ্চ ধর্ম্ম আবদ্ধ রহিল। জনসাধারণ বাহ্যক্রিয়া সকল লইয়াই সন্তুষ্ট রহিল। ক্রমশঃ ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল এবং বাহ্যক্রিয়ার আড়ম্বরে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি তিরোহিত হইল। এই সময়ে শাক্যসিংহ আসিয়া মুক্তির আর এক পথ দেখাইলেন। অষ্টসোপানমার্গ দিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের উপায় প্রদর্শন করিলেন এবং নিজ জীবনে তাহা সাধন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। জনসমাজ বিপর্য্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহু দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। কালসহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইলে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল। উপনিষদের একেশ্বর বাদ চলিয়া গিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতা আসিলেন। এত দূর পরিবর্তন হইল যে এক দিকে বাহ্যক্রিয়ার মহা সমারোহ, অপর দিকে জীবন অতি হীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত, নদী হ্রদে পবিত্রতা আরোপ করিয়া তাহাতে স্নান ও তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি পাপ-মোচনের সহজ উপায় সকল ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইল।

২। মত ও বিশ্বাস।

কতকগুলি মত ও বিশ্বাস ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ,

পরমাণু নিত্য তাহা হইতে কি জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা শূন্য হইতে ব্রহ্ম তাহা সৃজন করিয়াছেন, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ, পূর্ব্ব ও পরজন্ম, জড় ও মায়াবাদ, সাকার ও নিরাকার বাদ, অবতারবাদ এবং কোন সাধু পুরুষকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী করিয়া সেই সাধুর শরণাগত হইয়া মুক্তিলাভ, ইত্যাদি মতের উপর ধর্ম্মকে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে পৃথিবীতে অগণ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ঐ সকল মতের বিচারে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পণ্ডিতেরা কত গ্রন্থ রচনা করিয়া মানুষকে বিক্ষিপ্ত ও সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিলেন। ধর্ম্ম-যুদ্ধে পৃথিবী আকুল হইয়া পড়িল।

৩। পূজা।

বিভিন্ন প্রকারের পূজাকে তৃতীয় শ্রেণী বলা যাইতে পারে। নিরাকার পূজা, অবতার পূজা, মূর্ত্তি পূজা এবং ব্রহ্মের কোন কোনও স্বরূপ একটি চিত্রেতে অঙ্কিত করিয়া তাহার পূজা প্রচলিত আছে। উপনিষদের আর্য্য ঋষিগণ, ইহুদিরা এবং মুসলমানেরা নিরাকার ব্রহ্মের পূজার প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক লোক কেবল কোন চিহ্নের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল পূজাই ধর্ম্ম বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সকল, ধর্ম্মের এক এক অঙ্গ ও ভাব মাত্র। এ সকলেও ধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। সাময়িক অবস্থানুরূপ বিধাতার নানা প্রকার ব্যবস্থা মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপের প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে ঠিক এই প্রকার ঘটিয়াছিল। সেখানেও প্রথমে কতকগুলি বাহ্যক্রিয়া ধর্ম্মবোধে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইলে ইউরোপের অবস্থান্তর হয়। পরে ক্যাথলিক ধর্ম্মের এমন শোচনীয় অবস্থা ঘটে যে, সংস্কারক লুথারের প্রয়োজন হইল। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণ পরিশুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু প্রটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিক দলে মত ও বিশ্বাস লইয়া এরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল, যে জ্বলন্ত চিতাগ্নিতে কত নরহত্যা হইয়া গেল। কালসহকারে চ্যানিং ও থিয়োডার পার্কার প্রভৃতি নেতাগণের নেতৃত্বে ইউরোপে ও দূর আমেরিকাতে ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উদারতা ও ক্ষমা আসিয়া শান্তি স্থাপন করিতেছে।

যুগ-ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম-রাজ্যের এবম্প্রকার অবস্থায় ভগবান সর্ব্বাঙ্গীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। সে ধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন যে, ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। পরমাত্মা পূর্ণ ও অশরীরী। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি এবং সসীম, কিন্তু তাহা অশরীরী ও অমর। অগ্রে আপনাকে জানিয়া পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করা, কামনা ও স্পৃহা নির্ব্বাণ করা, সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। জ্ঞানযোগে সেই জ্ঞানময়ের পূজা করা, সাধনা দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করা এবং তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও যোগানন্দ উপভোগ করা, সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। পরব্রহ্মে প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বপিতা ও সকল নরনারীকে তাঁহার সন্তান জ্ঞানে ব্রহ্মপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করা সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। অধ্যাত্মযোগে ব্রহ্মের অনুজ্ঞা সকল প্রণিধান করিয়া জীবনের কার্য্য ও নরনারীর সেবা করা সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। ফলতঃ যে

ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন হয় না—সে অনুষ্ঠান ব্রহ্মলাভের সহযোগী নহে। সংসারাশ্রমে থাকিয়া অথচ তাহার অতীত হইয়া আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই সে ধর্ম্মের উপদেশ।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় নাই।

ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না। ব্রতাবলম্বন করিয়া যতি হইলেআত্মা স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্থির ও নির্ম্মল হয় এবং তখন তাহাতে পরমাত্মার ছবি প্রতিফলিত দেখা যায়। সেই জন্য যুগ-ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে সংযম অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন। আমি হোম যাগ যজ্ঞ করিলাম, নদ নদী হ্রদকে পবিত্র জ্ঞানে প্রতিদিন তাহাতে অবগাহন করিলাম, দেহকে মার্জ্জিত করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধিতে চর্চ্চিত করিলাম, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বসনে তাহাকে আচ্ছাদিত করিলাম, শরীরের শুচি হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আত্মার শুচি চাই। রিপুগণকে আপন বশে আনিতে হইবে। তাহারা প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় আমাকে বিপথে লইয়া যাইতেছে। বিবেক সারথি তাহাদিগকে সংযম করিতে পারিল না। তবে আর আমার কি হইল? হায়! কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও চাতুরী দ্বারা ধনোপার্জ্জনে আমরা পরাঙ্মুখ হই না। স্বার্থসাধনে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই এবং ব্যভিচারে আত্মাকে কলুষিত করি।

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্"

নিজ আত্মা-রূপ শ্রেষ্ঠ কোষ-মধ্যে সেই নির্ম্মল ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে আর তীর্থ পর্য্যটনে, দেব দর্শনে ও উপাসনা মন্দিরে গমন করিয়া কি অভিষ্ট সিদ্ধ হইল? এই সুন্দর মনোহর ও বিচিত্র বাহ্য-জগতে বিশ্বরচয়িতার জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইতিহাসে সেই বিধাতা, পুরুষ-রূপে কার্য্য করিতেছেন, সেখানে তাঁহার হস্ত দেখিলাম না। হায় ব্রহ্মদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমি পরমাত্মাকে প্রিয় বলিয়া বুঝিলাম না, সেই অক্ষর ব্রহ্মে প্রীতি স্থাপন করিলাম না, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে প্রিয় করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে অক্ষম রহিলাম এবং চলিষ্ণু ক্ষণভঙ্গুর পদার্থকে প্রিয় জ্ঞানে তাহার মায়ায় বদ্ধ হইলাম। কাজেই ঐ সকল বস্তুর অভাবে আমাকে সতত হাহাকার করিতে হইতেছে। সেই সারাৎসার ভগবানে যদি প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহাতে আত্মা সমাধান করিতে শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আমার এ প্রকার দুর্দ্দশা হইত না। অনাথ আশ্রম-সকলের অভিভাবক ও অভিভাবিকারা অনাথ নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগকে, কত যত্নে ও স্নেহে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়া থাকেন। হায় আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি তাহাতে নিয়োজিত করিতে পারিলাম না।

এই সংসারে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র অতীব প্রশস্ত। সেবাধর্ম্মের মত আর কিছু নাই। জীবে দয়া, জীবের দুঃখ মোচন করা এবং মানুষের সেবা করাই ভগবানের প্রিয় কার্য্য।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আমি স্বার্থপর হইয়া নিজের ও পরিবার বর্গের সেবায় কালাতিপাত করিলাম। পর দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম না। জনসাধারণের হিতসাধন পক্ষে আপনার শক্তি সামর্থ্যকে কিঞ্চিৎ পরিমানেও নিয়োজিত করিলাম না। ইতর জন্তুর সহিত আমার পার্থক্য কোথায় রহিল।

হে ভগবান্! তুমি আমাকে অনেক দেখাইলে ও শুনাইলে। এমন জীবন্ত ও পূর্ণ যুগ-ধর্ম্ম আমার সম্মুখে ধরিলে। আমি তাহা আপন জীবনে গ্রহণ করিতে পারিলাম না! আমার দশা কি হইবে!

সেখ সাদি।

বার্দ্ধক্য।

জীবন ত অবসন্ন প্রায়। কয়েকটি মুহূর্ত্তের বিলম্ব রহিয়াছে। আমার আত্মা দেহ হইতে চলিষ্ণু। পৃথিবীতে আসিয়া কয়েক গ্রাস মাত্র আহার করিয়াছি। অদৃষ্ট আসিয়া আদেশ করিল, যথেষ্ঠ হইয়াছে, চল, আর কাজ নাই।

চিকিৎসক মুখবিবর হইতে সজোরে ভগ্নদন্ত উৎপাটন করে; জান না সে কি কষ্ট। মৃত্যু আসিয়া দেহ হইতে আমার অস্তিত্ব টানিয়া তুলিতেছে; ভাব দেখি আমার কি নিদারুণ যন্ত্রণা।

তুমি আমার রোগ শান্তির জন্য চিকিৎসক আনিবার কথা বলিতেছ। কিন্তু গৃহের অঙ্গরাগে কি হইবে। দেখিতেছ না যে আমুল ভিত্তি কাঁপিতেছে।

কোন এক বৃদ্ধের সহিত সুন্দরী যুবতীর পরিণয় হইয়াছিল। বৃদ্ধ যথেষ্ঠ স্নেহ করিত, কিন্তু স্ত্রীর মন উঠিত না। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া যুবতী একটি অশান্ত সুশ্রী যুবককে পতিত্বে বরণ করিল। পত্নী নূতন পতির সৌন্দর্য্যে এমনই বিভোর, যে তাহার অসদাচরণেও ক্ষুব্ধ হইত না, বলিত আমি তোমার সহিত নরকের যন্ত্রণাও ভোগ করিতে প্রস্তুত, বৃদ্ধের সঙ্গে স্বর্গবাসও চাহি না। তোমার মুখে পলাণ্ডুর গন্ধ আমার ভাল লাগে, কদাকারের হস্তে গোলাপও আমার অতৃপ্তিকর।

তুমি গন্তব্য পথের শেষ সীমায় পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছ। ধীরে চল। আরব অশ্বের ন্যায় নিতান্ত দ্রুত চলিও না। শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িবে। দেখ উষ্ট্র দিবারাত্র চলিয়াও কাতর হয় না।

অনেক দিন হইল একটি প্রফুল্লবদন উৎসাহী যুবককে দেখিয়াছিলাম। বহুকাল পরে দেখি সে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিবাহ করিয়া সন্তান সন্ততিতে পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে তাহার সে আনন্দ নাই, সকল প্রকার তৎপরতা চলিয়া গিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ বলিল, যৌবনের যে স্রোত চলিয়া গিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবার নহে। শস্যে পাক ধরিলে সে কি আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে। হায়! আমার সেই পূর্ব্ব আনন্দের অবস্থা একেবারেই তিরোহিত।

প্রৌঢ়! কলপ দিয়া তুমি তোমার কেশদাম কালো করিতে পার। কিন্তু আমার বার্দ্ধক্যজনিত কুব্জ-পৃষ্ঠ আর সোজা হইবার নহে।

একদিন আমার বৃদ্ধা মাতাকে অকারণ তিরস্কার করিয়াছিলাম। মাতা ক্ষুণ্ণ হইয়া সাশ্রু-নয়নে বলিলেন, বাল্যের তোমার সেই অসহায় অবস্থা কি মনে পড়ে না। এক্ষণে তুমি বলশালী হইয়াছ, জান না কি সেই অসহায় অবস্থায় কেবল আমার

এই বক্ষকেই তুমি সজোরে ধরিয়া থাকিতে। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি এই অসহায়া বৃদ্ধাকে তিরস্কার করিতে হয়।

যৌবন ও প্রেম।

হৃদয়কে যে অধিকার করিতে পারে সেই ত প্রকৃত সুন্দর। যাহার উপর প্রেম পড়িয়াছে, তাহার নিকট নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রত্যাশা করিও না। প্রেমের মিলনে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রেমের তাড়নে অনেক সময়ে সতীত্বের ও সাধুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। যখন স্বর্গের লোভ অপরকে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তখন স্বর্ণত ধূলিমুষ্টির সমান।

সমগ্র কোরাণ একজনের কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু হায় প্রেমের চিন্তাতে যখন সে নিমগ্ন, সে অক্ষর পর্য্যন্তও ভুলিয়া যায়।

কোন এক সুন্দর যুবার উপরে গুরুর বিশেষ প্রীতি পড়িয়াছিল। শিষ্য তাহা লক্ষ্য করিয়া গুরুকে বলিল, মহাশয় ত্রুটি দেখাইয়া আমাকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিবেন। গুরু উত্তরে কহিলেন, আমার দ্বারা তাহা ঘটিবে না। আমি তোমার সবই সুন্দর দেখি। ভৎর্সনার ভার অপরের উপর প্রদান কর। হায়! প্রেমিকের চক্ষু অজস্র ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না, একটি মাত্র গুণ দেখিয়াই সে বিমুগ্ধ।

প্রেমাস্পদ বন্ধু গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া সাগ্রহে আসন ত্যাগ করিতে গিয়া জামা লাগিয়া হঠাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। আলোক নির্ব্বাণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, আমার কুটীরে যখন তোমার আবির্ভাব হইয়াছে, অন্য আলোকের আবশ্যক কি?

কোন প্রেমিক তাহার প্রেমের পাত্রী অলোকসামান্যা সুন্দরীকে বলিয়াছিল অপরে তোমার সহিত আলাপ করিতে পায় কেন। সুন্দরী বলিল আমি আমার সৌন্দর্য্যে জ্বলিতেছি, কীট পতঙ্গ আসিয়া যদি ঝাঁপ দেয়, কি করিব। তুমি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিও।

সে সম্পদের সুখ কি বুঝিবে, যে দারিদ্র্য না সম্ভোগ করিয়াছে।

অনুতাপ দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু হায় নিন্দুকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কোথায়?

মদিরা পানে যে উৎফুল্ল, সে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রিত থাকে। কিন্তু যে ঈশ্বরের অমৃত পান করিয়াছে, শেষ-বিচার দিনই তাহার শুভ প্রাতঃকাল।

পার্থিব কোন বিষয়ে এতটা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িও না, যে তাহার অভাবে তোমার অন্তর অশান্ত হইতে পারে।

তরঙ্গ না থাকিলে সমুদ্র-ভ্রমণ কতই তৃপ্তিকর, কণ্টক না থাকিলে গোলাপের সঙ্গ কতই মধুময়।

আনন্দের উদ্যানে আমি ময়ূরের ন্যায় সগর্ব্বে বিহার করিতেছিলাম, কিন্তু আজ প্রেমের পাত্রের বিরহে সর্পের ন্যায় ছটফট করিতেছি।

আমার প্রেমের সামগ্রীর সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাইতেছে না। আমার চক্ষু দিয়া দেখ দেখি, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে।*

সুন্দরদাস।

আত্ম-জ্ঞান।

১

শুনে না শ্রবণ, দেখে না আঁখি,
শুঁকিয়া আত্মারে না পায় ঘ্রাণ;

* ইহার কোন কোন অংশ পত্রিকার অনুপযোগী হইলেও সাদির বৈচিত্র দেখাইবার জন্য দিলাম এবং এইখানেই সাদির অনুবাদ পরিসমাপ্ত হইল।

পরশি পাইতে ত্বক্ না পারে,
পারে না জিহ্বা করিতে বাখান।

২

মন বুদ্ধি হারে জানিতে যাঁরে,
চিত্ত অহঙ্কার তাঁরে কি জানে?
শোভন-শব্দ স্তবধ বর্ণনে
আত্মারে আপনি আত্মাই জানে।

৩

সূর্য্য দেখা যায় সূর্য্যের তেজে
চাঁদের আলোতে চাঁদ পরখি,
নভে জ্বলে তারা নিজ আলোকে
তড়িতে তড়িৎ উঠে চমকি।

৪

দীপেরে প্রকাশে দীপ জ্বলিয়া
হীরাতে হীরার পায় আভাস,
তেমনি, সৌম্য! জানিও আত্মারে,
নিজ জ্ঞানে হয় নিজে প্রকাশ।

৫

বিশ্ব-সৃষ্টি, কেহ কহে, স্বভাবে,
কেহ কহে, কর্ম্ম তাহার মূল,
কাল, কেহ তার কারণ ভনে,
কেহ বকে আরো কতই ভুল।

৬

অকস্মাৎ কেহ, কেহ বা ব্রহ্মা
কল্পে স্রষ্টা বলি; কেমনে মানি?
হে সুন্দর! যদি না অনুভবিলু,
অন্তর-আত্মারে কেমনে জানি?

৭

কেহ বা বিচারে আকাশ মোক্ষ,
পাতাল কাহারো মোক্ষ নির্দ্দেশ;
কেহ বা কিছুই না পারি বুঝিতে
এখানেই, বলে, সকলি শেষ।

৮

শিলায় কাহার মোক্ষ বিচার,
ছায়ামাত্র কেহ আশ্রিতে চায়,
হে সুন্দর! শুন, আত্মজ্ঞান বিনা
নাহিক মোক্ষ অন্য কোথায়।

৯

মরণে মোক্ষ কহেন পণ্ডিত,
জৈনেরও মোক্ষ মরণে কেনা,
মরণে মোক্ষ তপস্বীও বলে,
মরণে মোক্ষ কহে শিবসেনা।

১০

ম্লেচ্ছও কহে ওই এক কথা,
এ নহে, বাণী সন্দেহ ভিন্ন;
হে সুন্দর! তুমি লভ আত্মজ্ঞান,
তাহা ছাড়া মোক্ষ নাহিক অন্য।

প্রার্থনা।

প্রতিদিন ভয়ে ভয়ে শুধু চেয়ে থাকি,
আকুল কাতর হৃদে তোমারেই ডাকি।
বিষম পরীক্ষা স্মরি, দুর্ব্বল হৃদয়
হতেছে কাতর, বিভু করুণা নিলয়,
তোমার করুণা বিনা জানি মনে আমি
কে রাখিবে? ওগো দেব ওগো অন্তর্যামী
আমার সকলি তুমি জানিতেছ, তবু
পরীক্ষা করিতে মোরে কেন চাও প্রভু?
দীন আমি অতি দীন, আমি ক্ষুদ্রতম,
তুমি ভূমা অন্তহীন,—এ জীবনে মম
কি লীলা তোমার প্রভু? এ চিত্ত দুর্ব্বল
কি শক্তি বিকাশে তুমি করিবে সফল!
নাই ভক্তি, নাই বল, নাই মোর ভাষা,
তোমার করুণা আছে এই মোর আশা।

প্রার্থনা।

(জ্যোৎস্নার * জন্মদিনে)

দয়াময় জ্যোৎস্না মোর তব দত্ত দান,
তারে পেয়ে গেছে দুঃখ, জুড়ায়েছে প্রাণ।
তোমার এ দান আমি যতনে আদরে,
রাখিয়াছি কি আনন্দে সদা স্নেহ ভরে,
জান তুমি দয়াময়, আমার কামনা
কি জাগিছে অন্তরেতে, কি মোর প্রার্থনা।

* কবির পুত্রের নাম।